আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরানী চন্দ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ... ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

নিবেদন

গত কয়েক বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথাবার্তা আলোচনাদি করিয়াছেন এই পুস্তকে শ্রীযুক্তা রানী চন্দ সেগুলি সাধারণের গোচরে আনিয়াছেন। এই লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়া দিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে এমন কিছু থাকিতেও পারে যাহা তিনি পরিবর্তন বা পরিবর্জন সাপেক্ষ মনে করিতে পারিতেন।

মুখের কথাকে লিখিত ভাষায় রূপদান করিয়া লেখিকা যদি সাফল্য অর্জন করিয়া থাকেন তবে সে কৃতিত্ব তাঁহারই; যদি ত্রুটি কিছু থাকিয়া গিয়া থাকে তাহার জন্যও তিনিই দায়ী।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৯

আজ পঁচিশে বৈশাখ—গুরুদেবের জন্মদিন; দিকে দিকে তাঁর জন্মোৎসবের কলরব উঠছে। তিনি বলতেন "ধরতে গেলে প্রতিদিনই তো মানুষের জীবনে নববর্ষ আসে, প্রতিদিনই সে নবজন্ম লাভ করে, প্রতিদিনই নতুন করে তার পর্ব শুরু হয়। তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেলে রাখা ঠিক নয়।"

এখন ভাবি কত দ্রুত চললে, কতখানি এগিয়ে গেলে পর মানুষ এমন কথা বলতে পারে। আর আমরা বসে থাকি দিনের পর দিন—অপেক্ষায়; নবজন্ম আর কয়জনেই বা লাভ করি।

গুরুদেব চলে গেছেন, এখন তাঁর স্মৃতি নিয়েই দিন কাটছে। আমার শান্তিনিকেতন বাসের গত চোদ্দো বছরের মধ্যে দশবছর তাঁর অতি কাছেই ছিলুম। তাঁকে প্রণাম করে দিনের কাজে হাত দিতুম, সকালে উঠে তাঁর মুখই আগে দেখতুম জানালা দিয়ে। অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে উঠে বাইরে এসে একটি চেয়ারে বসতেন পুবমুখো হয়ে, কোলের উপর হাত দুখানি রেখে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃরাশ শেষ করে লেখা শুরু করে দিতেন। কোনোদিন দেখতুম বসেছেন কোণার্কের বারান্দায়, কোনোদিন তাঁর অতিপ্রিয় শিমুল গাছের তলায়, কোনোদিন মৃন্ময়ীর চাতালে, কোনোদিন শ্যামলীর বারান্দায়—আমগাছের ছায়ায়, কোনোদিন বা বাতাবিলেবুর গাছটির পাশে। সে যেন দেবমূর্তি দর্শন করতুম রোজ। মানসচোখে প্রতিদিনকার সে সব মূর্তি এখনো দেখি; আরো দেখব যতদিন বাঁচব।

ভোরে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা গুরুদেব পছন্দ করতেন না। বলতেন—"এমনি করে দিনের অনেক খানি সময় আলস্য খাবলে নেয়, এ হোতে দেওয়া কারুরই উচিত নয়।" তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বাইরে এসে তাঁকে প্রণাম করে কাছে বসতুম। প্রাতঃরাশের সময় তিনি প্রায়ই

হালকামনে হাসিতামাশা গল্পগুজব করতেন। কোনো কোনোদিন বেশ কিছুক্ষণ সময় এভাবে কাটিয়ে দিতেন; যেদিন দেখতুম যেন একটু অন্যমনস্ক ভাব গল্প শুনতে শুনতে বা বলতে বলতে দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে থেমে যাচ্ছেন, সেদিন তাড়াতাড়ি আসর ভেঙে যে যার সরে পড়তুম; বুঝতুম লেখা কিছু মাথায় ঘুরছে। তিনি সেখানেই বসে খাতা খুলে নিয়ে লেখা শুরু করে দিতেন; রোদ্দুর কড়া না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বসেই লেখা চলত।

পেয়েছি তাঁকে কত ভাবে কতদিক থেকে। "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই"—এমন করে পরকে আপন করতে পারে এমন লোক আর যে দুটি দেখি না আজকের দিনে। কতভাবে কতদিক থেকে কাছে টেনেছেন, দিয়েছেন অজস্র ঢেলে যোগ্য অযোগ্য নির্বিচারে—ফলাফলের ভাবনা না রেখে। তিনি মহামানব, যুগের অবতার ছিলেন; অতি নগণ্য আমি নাগাল পাব তাঁর কী করে। কিন্তু তিনি যে মানুষ হয়েই ধরা দিয়েছিলেন, কাছে টেনেছিলেন। মানুষ হিসাবেই তাঁকে জেনেছি পেয়েছি বেশি।—

প্রতিদিনকার কতঘটনা আজ থেকে থেকে মনে পড়ছে। তিনি তো শুধু গুরুদেব ছিলেন না আমাদের, স্নেহ ক্ষমা দিয়ে পিতার মতো আগলে রেখেছিলেন, সংকটে সম্পদে বন্ধুর মতো উৎসাহ উপদেশ দিতেন, আবার গুরুর মতো বল ভরসা দিয়ে পথ চলতে শেখাতেন। কত সময়ে অসময়ে একটুকুতেই ছুটে যেতুম তাঁর কাছে। বলবার কিছু প্রয়োজন হোত না, অথচ তাঁর কাছে গোপনও কিছু থাকত না। কথাচ্ছলে মনের সকল প্রশ্নের উত্তর মিলত, সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত, দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভয় ভাবনা কাটত, মাথার পরে তাঁর স্নেহপরশ প্রাণে যেন অভয় মন্ত্র জাগিয়ে দিত। শান্তপ্রাণে যখন উঠে আসতুম তাঁর মুখে সে স্নিগ্ধ হাসির আভাষ প্রাণে যে কী ঢেলে দিত তা' বোঝাই কী করে।

যতদিন তাঁর পায়ে চলার ক্ষমতা ছিল, যখন তখন বাড়িতে এসে

আমাদের অবাক করে দিয়ে যেন মজা পেতেন। কতদিন দুপুরে বসবার ঘরে ঢুকে হাতের কাছে কাগজ পেনসিল যা পেয়েছেন, তাই নিয়ে ফরাসে বসে বসে ছবি আঁকছেন, আমরা কিছু জানিনে। হঠাৎ তাঁর কাশির শব্দে ছুটে এসে অনুযোগ করতুম, "কেন জানতে দেননি, কেন ডাকেননি"—মধুর হাসিতে সব ভুলিয়ে দিতেন। কখনো বা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত, একসময়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাজ দেখছেন, হঠাৎ তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে খুশিতে ভরে উঠি। পিঠের দিকে ঘোরানো ডান হাতটি এগিয়ে দেন। হাতে তাঁরই আঁকা ছবি একখানি, তা'তে লেখা 'বিজয়ার আশীর্বাদ'। খেয়াল হোলো সত্যিই তো আজ বিজয়া। সকাল থেকে এই কথাটাই ভুলে ছিলুম; কিন্তু যিনি আশীর্বাদ করেন তাঁর যে ভুল হয় না। দু-হাতে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলুম।

বাগান করবার শখ হোলো আমার। গরম কাল, বেলা দুটোর সময় একদিন 'দেশ' পত্রিকার কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছেন গুরুদেব আমাকে দিতে ও দেখাতে। শুধু তাই নয়, আগাগোড়া জোরে জোরে পড়ে বুঝিয়ে দিলেন। শেষে ঠিক হোলো এ জমিতে এবার চিনেবাদাম লাগালে জমি ভালো হবে। কাঁকর ও বালি মেশানো জমি, তাতে আর বাগানের কীই বা বাহার করতে পারি; তবু, উৎসাহ দেবার জন্যে কতদিন বিকেলে, আমার এই বাগানে ছোট্ট গোলঞ্চ গাছের ছোট্ট ছায়াটিতে এসে বসতেন। কতদিন বিকেলে এই বাগানেই আসর জমত।

ছয়মাসের শিশু অভিজিত আমার একদিন হঠাৎ মাঝরাতে দারুণ কান্না জুড়ে দিলে। কারণ বুঝতে পারিনে, বাড়িতে অন্য কেউ নেই তখন। ঐ অসহায় শিশুর কাছে নিজেকে আরো অসহায় মনে হোলো। কী করি। আবার এক ভাবনা—পাশে শ্যামলীতে গুরুদেব আছেন। নিশুতি রাতে এই কান্নায় যদি গুরুদেবের ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি সে দিকের জানালা বন্ধ করে দিলুম। খানিকবাদে দরজার কাছে

গুরুদেবের ডাক শুনি, দরজা খুলে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে। খোকার কান্না শুনে বাইরে বেরিয়ে ভৃত্য বনমালীকে উঠিয়ে বাতি জ্বালিয়ে বাইওকেমিকের বাক্স থেকে বেছে ওষুধ নিয়ে নিজে এসেছেন। বললেন "বোধ হয় ওর পেটে ব্যথা হচ্ছে কোনো কারণে, কান্নার সুরে সে রকমই মনে হোলো; এই ওষুধটা খাইয়ে দে দেখিনি।" সেদিন চোখ দিয়ে আমার টপটপ করে জল পড়েছিল এই ভেবে যে, আমার জন্য এমন করেও ভাববার লোক আছে। আর আজও চোখ দিয়ে তেমনি করেই জল পড়ছে এই ভেবে যে, অমন করে কে আর আমার জন্য ভাববে।

ছবি আঁকার সময়ে কাছে কেউ থাকে তা তিনি চাইতেন না। গোড়াতে যখন ছবি আঁকতেন—দূরে দাঁড়িয়ে থাকতুম। পেলিক্যান রং-এর শিশিগুলো দেখতে দেখতে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আরো জানা হয়ে গিয়েছিল গুরুদেব কোন্ রং-এর পর কোন্‌টা লাগান ছবিতে। গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, তিনি রং-কানা, বিশেষ করে লালরংটা নাকি তাঁর চোখেই পড়ে না—অথচ দেখেছি অতি হালকা নীল রংও তাঁর চোখ এড়ায় না। একবার বিদেশে কোথায় যেন ট্রেনে যেতে যেতে তিনি দেখছেন অজস্র ছোটো ছোটো নীল ফুলে রেললাইনের দুদিক ছেয়ে আছে। তিনি বলতেন "আমি যত বৌমাদের ডেকে ডেকে সে ফুল দেখাচ্ছি—তারা দেখতেই পাচ্ছিলেন না। আর আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম—এমন রংও লোকের দৃষ্টি এড়ায়।"

দেখেছি গুরুদেবের ছবিতে লালের প্রাচুর্য, তবু নাকি লালরং ওঁর চোখে পড়ত না অথচ নীলরং দেবার বেলায় কত কার্পণ্য করতেন। সে কথা বলাতে মাঝে মাঝে দু'একটা landscape-এ নীলরং দিয়েছেন কিন্তু মন খুঁতখুঁত ক'রে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম তাঁর ছবি আঁকা, নেশার মতো পেয়ে বসেছিল আমাকে। রং এর পর রং লাগাতেন। এত তাড়াহুড়োতে ছবি আঁকতেন—খেয়াল থাকত না কী রং লাগাতেন, রং বেছে নেবার

অবসর নেই, হাতের কাছে যে শিশি পাচ্ছেন, তাতেই তুলি ডুবিয়ে নিচ্ছেন। অনেক সময় উলটো রং লাগিয়ে ফেলবার জন্য আগাগোড়া ছবিই শেষপর্যন্ত বদলে ফেলতেন। দেখে দেখে আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল উনি কোন্ রং এর পর কোন্ রং ব্যবহার করে খুশী হন, কোন্ ছবিতে কী কী রং লাগবে। ছবির সূচনা দেখেই আমি সেই সেই শিশি হাতের কাছে রেখে অন্য শিশিগুলি দূরে সরিয়ে রাখতুম। কখনো বা হলদে আকাশের জন্য রং নিতে গিয়ে কালোর শিশিতে তুলি ডোবাতে যাবেন, তাড়াতাড়ি হলদে শিশি এগিয়ে দিতুম। তিনি হেসে উঠতেন বলতেন—দেখ্‌লি, আর-একটু হোলেই সর্বনাশ হোত। কিছুদিনের মধ্যে আমাকেও তাঁর কেমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, ছবি আঁকতে শুরু করলেই ডেকে পাঠাতেন, কাছে থেকে রং সরিয়ে দিলে খুশী হতেন। আমিও ওঁর ছবি আঁকা দেখতে দেখতে মজে যেতুম।

কত সময়ে আমাকে মডেল করে ছবি আঁকতেন যদিও ছবিতে ও আমাতে কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পেতুম না। প্রথম প্রথম মনে একটু লাগত, পরে এ থেকেই বড় মজা পেতুম। অনেক সময় আবার তাঁর হাতে কাগজ পেনসিল দিয়ে নিজে পোজ দিয়ে বসতুম, বলতুম—"আঁকুন, আমাকে।" তিনিও হাসিমুখে ছবি আঁকতে শুরু করতেন। এক মিনিটের বেশি চুপ করে থাকতে হোত না। তারই মধ্যে পেনসিলে লাইন ড্রয়িং করে নিয়ে তারপরে চলত তার উপরে রং-এর পর রং-এর প্রলেপ; হোতে হোতে সে ছবি যে এক-একবার কী মূর্তি ধরত—দেখতে দেখতে দুজনেই হেসে উঠতুম। তিনি বলতেন "তোর মনে গর্ব হওয়া উচিত, দেখ্ তো—আমি কতরূপে তোকে দেখছি।"

কাছে থাকি, চুপ করে থাকতে যদি আমার খারাপ লাগে এই ভেবে ছবি আঁকতে আঁকতেও কত গল্প করতেন; আবার ছবির সঙ্গে কথা কইতে কইতে ছবি আঁকতেন, "কী গো, মুখ ভার করে আছ কেন।

আর-একটু রং চাই তোমার? কালো রংটা তোমার পছন্দ হোলো না বুঝি? আচ্ছা, এই নাও; দেখো তো কত করে তোমার মন পাবার চেষ্টা করছি তবু তোমার চোখ ছলছল করছে। তা থাকো ছলছল চোখেই, আমি আবার একটু জলভরা নয়নই ভালোবাসি কিনা দেখতে।" আমার কত যে মজা লাগত, ছোটো খুকির মতো পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনে,—চোখমুখের ভঙ্গী দেখে খিলখিল করে হাসতুম। আবার ভাবতুম—এমনি করে কথা না কইতে পারলে সৃষ্টি করে আনন্দ পাওয়া যায়? কতদিকে কতভাবে তিনি চোখ ফুটিয়ে দিতে দিতে চলতেন। আজ ভাবি সে সব দিনের কথা, কত ছবি চোখে ভেসে উঠছে—কত সুর কানে বাজছে।

নিজের খেয়ালখুশি মতো ব্যক্তিগত আলাপআলোচনা খাতার পাতায় কখনো কখনো রেখে দিতুম। কতদিনের কত কথা স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে ফেলেছি। যেটুকু রেখেছিলুম তাই খুঁজে বের করে আজ বারে বারে চোখের সামনে ধরেছি—তাঁর কথা যেন এখনো কানে শুনতে পাই, তাঁকে স্পষ্ট দেখি সামনে। তাঁর মুখের নতুন নতুন বাণী আর পাব না, আর-কেউই পাবে না। তাই এ জিনিস একলার জন্যে রাখতে নেই। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত কথা বা প্রশ্নের উত্তর নয়, এর মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু পাবেন, এই ভেবেই এ যেমন ছিল তেমনই সবার সামনে এনে দিলুম।

আমি অযোগ্য—তা সত্ত্বেও তিনি দিয়ে গেছেন, বলে গেছেন কত ভাবে; নিতে যেন পারি তা অন্তরে এই আশীর্বাদও আজ যেন তিনিই করেন আমায়—শূন্য চৌকির পাশে লুটিয়ে পড়ে আকুল প্রাণের প্রার্থনা জানাচ্ছি তাঁর পায়ে।

শান্তিনিকেতন
১৩৪৯

শ্রীরাণী চন্দ

৭ই জুলাই, ১৯৩৪

সকালে গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলুম, দেখি তিনি লিখবার টেবিলের সামনে চেয়ারে পিঠ ঠেস দিয়ে বসে আছেন, চিন্তিত বিষণ্ণ ভাব। প্রণাম করে কিছু না ব'লে পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। খানিকবাদে তিনি ক্লান্তভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন'

দেখো, এই সংসারটা মোটেই ভালো জায়গা নয়। চারদিকে এমন দুঃখকষ্টে ঘেরা—চারদিক এর এমন অন্ধকার। ভালো আর লাগে না। রাতে যখন শুতে যাই এই সমস্ত গ্লানিতে মন ভরে ওঠে। আর ইচ্ছে করে না চলতে, ইচ্ছে করে না কোনো কাজ করতে এই সংসারে। এখন আবার কেউ বলে কিনা প্যালেস্টাইনে যেতে। কী হবে। এখন মরতে পারলেই বাঁচি। কী হবে তোমাকে আমার সব দুঃখের কথা বলে। তোমার এখন নতুন সংসার, নতুন মন, নতুন উদ্যম। চলে যাও যদ্দিন পারো এই মন নিয়ে—

বিকেল

গুরুদেব সকাল থেকে আজ একটানা লিখেই চলেছেন। সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, ঘরের ভিতরে দিনের আলো ম্লান হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এই আলোতে লেখা কষ্টকর। বললুম—এবারে লেখা বন্ধ করে খানিকক্ষণের জন্যে বাইরে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে। শুনে কলমটি, খাতার যে পাতাতে লিখছিলেন, সেই পাতায় রেখে খাতাটি বন্ধ করে বললেন:

এ তো হোলো আজকের মতো। এখন ভাবনা হচ্ছে আবার প্যালেস্টাইনে যেতে হবে; কিন্তু এই রকম করে

আর কতদিন চলবে। এই দেহটাকে নিয়ে, আর যে পারি নে, এটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া আর সহ্য হয় না। কবে যে ছুটি পাব। কোনো কাজ থাকবে না, শুধু বসে বসে আকাশ, গাছ, রাস্তা, লোকজন দেখে দেখে দিন কাটিয়ে দেব, এমনি একটি জানালার ধারে বসে। লেখা, লেখা, ভালো লাগে না আর। ছবিও করতে পারছিনে। যখনই ভাবি আঁকি এইবারে, অমনি মনে হয় এই এই কাজ বাকি আছে, সমস্ত সেরে তবে আঁকব, কিন্তু সেই বাকি আর ফুরোয় না কিছুতেই। এর হাত থেকে আর রক্ষা নেই। কর্মস্থানে আমার শনি, কাজ আমাকে করাবেই করাবে। তা'তে বলেছে যে, কাজ আমাকে আমরণ করতেই হবে, তবে প্রথমটায় অনেক আঘাত, ব্যাঘাত, শ্লেষ, বিদ্রূপ, কষ্ট, গ্লানি থাকবে, পরে সুযশ হবে ; হচ্ছেও তাই।

৮ই জুলাই, ১৯৩৪

দুপুরে গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠালেন, বুঝলুম ছবি আঁকছেন। নয়তো এ সময়ে আমার ডাক পড়ে না। গিয়ে দেখি সত্যিই তাই—ছবি আঁকছেন। ছবি আঁকতে আঁকতে বললেন :

ছবিতে আমার, একটা বেশ মজা আছে। আমি তো ছবিতে এক'ই বারে রং দিই না। আগে পেনসিল দিয়ে ঘষে ঘষে একটা রং তৈরি করি মানান সই করে, তারপরে তার উপরে রং চাপাই। তাতে করে হয় কী—রংটা বেশ একটু জোরালো হয়।

বিকেল

এই পৃথিবীতে দেখ্ কিছুই ঠেকে থাকে না। পরে একটা মিটমাট হয়ে যায়ই—ভালোও লাগে পরে একে অন্যকে।

৯ই জুলাই, ১৯৩৪

আজকাল এত আস্তে আস্তে লিখি, কিছুতেই আর এগোতে চায় না। অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ছবি আঁকতেও তাই। কবে যে ছুটি পাব। কবে আমায় সবাই বলবে যে, "আর চাইনে তোমার কাছ থেকে কিছু, এবার তোমার ছুটি।" আমার একলার জন্যে হোলে কিছু ভাবতুম না, করতে হয় যে সকলের জন্য। এই আবার একটা লিখছি, হয়তো কিছু টাকা পাব। টাকা, টাকা—অভাব আর মেটে না কিছুতেই। আমার নিজের জীবনে তো এ-সবের কিছু দরকার ছিল না। এ আমি কোনোদিন ভাবিনি।

দুপুর

দেশ—সংসারের একটা যে-কোনো জায়গায় কিছু আয় করা প্রত্যেক মেয়েরই দরকার ব'লে আমার মনে হয়। কোনো crafts শুধু শৌখিন হিসেবে নয়, ব্যবসা হিসেবে নিতে হবে। crafts কেন, যে-কোনো একটা কিছু, যাতে করে সে আত্মনির্ভরশীল হোতে পারে। নিজের একটা নিজস্ব জোর থাকা খুবই প্রয়োজন মেয়েদের পক্ষে। যেমন সাঁতার জানা থাকলে ঝড়-জলে সাঁতরে পার হোতে পারে; জলে তখন ভয় থাকে না। জেনে রাখা ভালো।

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

১৩ই জুলাই, ১৯-৪

গান্ধীজি কলকাতায় আসছেন শুনে গুরুদেব তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসবার জন্যে তার করেছেন। বিকেলে দেখি তিনি চুপচাপ বসে আছেন। কাছে যেতে বললেন:

গান্ধীজি 'তার' করেছেন আমার এইবারের আমন্ত্রণে- তিনি আসতে পারবেন না, দুঃখিত; কলকাতার কাজের জন্যে সমস্ত দিনগুলিই booked করা। ফাঁক একটুও নেই। কী করা যায়। গান্ধীজি আসছেন কলকাতায়, অথচ দেখা হবে না। মহাসমস্যা। আমার এখানে এলেন না বলে, আমিও কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব না, এটা নেহাত ছেলেমানুষি দেখাবে। কলকাতায় গিয়ে একবার দেখা করতেই হবে। অথচ ওখানে গেলে এত জড়িয়ে পড়তে হয় সবটাতে। কোথায় রে বক্তৃতা, কোথায় রে মিটিং, কোথায় রে অভ্যর্থনা। করতেই হবে সব—একদিন দেখাও করতে হবে, সবার হয়ে কিছু বলতেও হবে।

১৪ই জুলাই, ১৯৩৪

অনেক সময়ে দেখি চলতে গেলে আজকাল গুরুদেবের পা টলে। লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে ভালোবাসেন না, কেউ ধরবে তাও পছন্দ করেন না। অথচ দু'পা হাঁটতে কত কষ্ট হয় ওঁর, দেখে স্থির থাকা যায় না, কিছু করতেও পারিনে। এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া-আসা করেন যখন আমরা পাশে পাশে থাকি। মাঝে মাঝে টাল সামলাতে না পারলে. নেহাত অপারগ হয়েই আমরা যারা কাছে থাকি, কাঁধে হাত

রাখেন। আজ বিকেলে তিনি পায়চারি করছিলেন। কারো উপর ভর দিয়ে পায়চারি করে মনে সোয়াস্তি পান না। বললেন:

দেখ্, কারো উপরে নির্ভর করতে হবে—এ বয়সটা ভারি খারাপ। আমি কোনোদিনই কারো উপর নির্ভর করতে ভালোবাসিনে। করিওনি কখনো। কোনোদিন যে করতে হবে একথাও কখনো ভাবিনি। কিন্তু এখন দেখছি পদে পদে আমাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, অথচ উপায় নেই, নিজের সামর্থ্যে কুলোয় না। এ যে আমার একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ। এমন কষ্ট হয় ভাবলে।

২৫শে জুলাই, ১৯৩৪

বেতের চেয়ারে গুরুদেব বসে আছেন, সামনে ছোটো টেবিলে দুখানি লিখবার খাতা, ছোট্ট ডায়েরিটি—তাতে কবিতা লেখেন, আর রয়েছে কলম রাখবার ছোটো লম্বা ধরনের রুপোর তারের কাজকরা তামার বাক্সটি। কমলারঙের জোব্বা গায়—ধবধব করছে সাদা রেশমের মতো চুল ও দাড়ি। মুগ্ধ দৃষ্টি সুদূরের পানে। লিখতে লিখতে বোধ হয় একসময়ে প্রকৃতির শোভাতে তন্ময় হয়ে গেছেন। স্থির হয়ে আমি দেখছিলুম তাঁকে, তিনি দেখছিলেন দূরকে। অনেকক্ষণ কাটল এমনি। কী কারণে এদিকে ফিরে তাকালেন, আমাকে দেখে স্নিগ্ধ হাসি হেসে উদাস নয়নে আস্তে আস্তে বললেন—

সংসারের কোনো ভাবনা না থাকত তো বেশ হোত। কেমন সুন্দর মেঘলা করেছে। অথচ সেই অনুপাতে বৃষ্টি হচ্ছে না; টিপ টিপ—দু-এক ফোঁটা, একটু একটু বাতাস—

বলতে বলতে তাঁর মুখের সেই স্নিগ্ধভাব যেন মিলিয়ে এল। তিনি ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন:

কোথায় এমন দিনে বসে বসে একটু আরাম করব, চুপটি করে বসে বসে এই সব দেখব,—না, সংসারের যত সব ভাবনা। পরের দায়ে এমন ঠেকেছি। বিধাতা যিনি—যখন পারে টেনে তুলবেন—নাকালের একশেষ ক'রে। এ পারের যত ঢেউ খেতে খেতে,—নাকানি চোবানি করে তারপরে তুলবেন।

দুপুর

সকাল থেকে আজ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, দুপুরেও তাই। মনটা কেমন লাগছিল, আস্তে আস্তে গুরুদেবের কাছে গেলুম। ছোটো টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কী লিখছিলেন। পায়ের কাছে গিয়ে বসতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এসেছি টের পেয়েছেন মাথায় হাত দিয়ে। আমার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন:

চুল এত ভিজে কেন। মাথায় তোমার ফাঁকা জায়গা যথেষ্ট আছে; কিন্তু এই রস সঞ্চারে তা ভরাট করলে তো সুবিধের বিষয় হবে না।

আমার মাথার ফাঁকা জায়গা সম্বন্ধে তাঁর ইঙ্গিত মোটেই সুখদায়ক নয়, অন্তত আমার কাছে। অভিমান করতে গিয়ে বরং হিহি করে হেসেই উঠলুম—তাঁর চোখে চোখ পড়তে।

তারপর কথায় কথায় সেকালের মেয়েদের কেশবিন্যাসের অনেক গল্প হোলো। চুল শুকোবার কত কত পন্থাই ছিল মেয়েদের আগে। গুরুদেব বললেন:

আগের কালে আমাদের মেয়েরা ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকোত। এখন যে কেন তারা তা করে না। তা'তে

করে চুল বেশ স্নুগন্ধ হোত! আর চুলে কোনো রোগের "জারম্" থাকলে, তাও মরে যেত।

২৬শে জুলাই, ১৯৩৪

সন্ধের খানিক আগে লেখা বন্ধ করে গুরুদেব আস্তে আস্তে হেঁটে কোণার্কের পশ্চিমদিকে ছোট্ট বাগানটিতে এলেন। এই বাগান থেকে সূর্যাস্ত দেখতে উনি ভালোবাসেন—প্রায়ই বিকেলের দিকে পায়চারি করতে করতে এদিকে চলে আসেন। আজ এটুকু আসতেই ওঁর কষ্ট হচ্ছে—চেয়ারটা তাই এগিয়ে এনে দিলুম, তিনি তাড়াতাড়ি তাতে বসে পড়লেন, একটু সামলে নিয়ে বললেন:

আজকাল এইটুকু হেঁটে আসতেই হাঁপিয়ে পড়ি। পারিনে আর এই দেহটাকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে।

শুকনো মুখে পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যথা পাই ওঁর মুখে এ ধরনের কথা শুনলে। তিনিও বুঝলেন আমাদের অবস্থা। কথার গতি ফেরাবার জন্যে মুখ টিপে হেসে বললেন:

ওগো, একদিন আমারও ছিল এই তোমাদের মতো নধর দেহ, গোল-গোল হাত, সবই ছিল। তখন কি ভাবতেও পারতুম এমনি অসহায় হয়ে পড়বে এই দেহটা। করো না, তাজা বয়সের অহংকার করো না। বেশিদিন থাকে না তা। আমাদের তবু তত খারাপ লাগে না—একরকম চলনসই থাকি, কিন্তু তোমাদের যা চেহারা হয়। তাই নিয়ে আমাদের এত স্তুতি, এত কাকুতি। তোমরা আবার ভালোও বাসো তা। কী করি, তাইতেই তো আমাদের বানিয়ে বানিয়ে এতও

বলতে হয়। তোমরা দেখি তা আবার বিশ্বাস করে গর্ব অনুভব করো।

সন্ধের পর গুরুদেবের কাছে গেলুম, বাইরের বারান্দায় খোলা আকাশের নিচে বসে আছেন। মনে হোলো ঘুমুচ্ছেন। কাছে গিয়ে দেখলুম তা নয় তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছেন, বললেন:

আজকাল এমন হয়েছে একটা জিনিস খুঁজছি অথচ খুঁজে পাইনে। কিসের যে সন্ধান করি জানিনে, কেন যে সন্ধান করি তাও জানিনে। কেবল জানি সন্ধানে আছি। এ খানিকটা ঠিক মাছধরার মতো। মাছ ধরছি—কিন্তু কোন্ মাছ উঠবে ছিপে, তা জানা নেই।

সন্ধান, মাছ, কিছুরই কিছু বুঝলুম না। নিঃশব্দে পায়ের কাছে বসে রইলুম।

২৮শে জুলাই, ১৯৩৪

সন্ধেবেলা বসে বসে গুরুদেবের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নানা গল্প শুনছিলুম। বড়ো ভালো লাগছিল। হাসিতে, ঠাট্টাতে, গল্পেগুজবে মাতিয়ে রাখছিলেন। এক জায়গায় পা-টেপানো নিয়ে গল্প করতে করতে বললেন:

গল্পগুচ্ছের "নামঞ্জুর" গল্পের যে জায়গায় পদসেবা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ার কথা আছে—তা আমার নিজের জীবনেই ঘটেছিল। তখন আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছি, সারা-গায়ে ব্যথা, ওষুধপত্র আনাআনি, ছুটোছুটি খুব চলেছে। তেতালার ঘরে রয়েছি। বৌমা একদিন বেরিয়েছেন রানীর* সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

* শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের স্ত্রী।

বৌমার সংসারের কাজের জন্যে তিনি একটি সঙ্গিনী গ্রাম থেকে আনিয়েছিলেন। বৌমার কাজে সাহায্য করত, একটু দূরে দূরেই থাকে সে। সেদিন শুয়ে আছি, গায়ে খুব ব্যথা, এপাশ-ওপাশ কবছি, এমন সময়ে সেই মেয়েটি এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমনিতে আমি কখনো কারো সেবা নিতে পারতুম না; কেউ আমার গায়ে হাত দেবে তাতে বরং বিরক্তই হতুম, কিন্তু সেই মেয়েটিকে আমি বারণ করতে পারলুম না। এমন সময়ে‘—’এসে ঘরে ঢুকল।‘—’ঢুকেই মেয়েটিকে দেখে এমন এক দৃষ্টি হানল, সে মেয়েমানুষ ছাড়া কেউ পারে না। সে গিয়ে তক্ষুনি বাড়ির দুটি মেয়ে এনে হাজির করলে আমার পদসেবার জন্যে। আমার পদসেবার একটা মূল্য আছে, সেখানে সেই মেয়েটি যেন আসতেই পারে না। তারপর চলতে লাগল আমার পদসেবা পুরোদমে। মানা-ও করতে পারিনে—মহা মুশকিল। টেপার দরুন পা আরো ব্যথা করতে লাগল। আমি মাঝে মাঝে আর না পেরে বলি—দেখো, হয়েছে—আর লাগবে না—কিন্তু কে কার কথা শোনে। পদসেবা চলতেই লাগল। তারপর না পেরে, শেষটায় নিচের তলায় চলে আসতে আমাকে বাধ্য হোতে হোলো। শেষে ঐ গল্পটা লিখি।

২৯শে জুলাই, ১৯৩৪

সেদিন বিজয়ার* চিঠি পেলুম। ছোট্ট একটি কার্ড লিখেছে "যদি তুমি আমায় কিছু লেখো।" একবার আসতে লিখে দিলুম। আমার জন্যে যে কী করবে দিশে পেত না। নিজের বাড়িতে সব চাইতে সেরা সুখসুবিধের মাঝে আমাকে রেখেছিল। অজস্র টাকা আমার জন্যে খরচ করেছে, তাতেও যেন ওর তৃপ্তি নেই। সবসময়ে তবু আশায় থাকত, আমি কী চাই। আমার 'চাওয়া' ও প্রাণ দিয়েও মেটাবে এমনি ভাব। ওদের সমাজে ওরা ছিল খুব aristocratic, অনেকটা পর্দার মাঝেই থাকত। ওদের সমান লোক ছাড়া কারো সঙ্গে আলাপ, মেলামেশা করত না। মাঝে মাঝে আমি কাউকে কাউকে চা'য়ে ডাকতুম, বিজয়া কখনো ওদের সামনে আসত না। ভিতর থেকে যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, সব দেখাশুনো করত, কিন্তু কখনো ওদের সঙ্গে আলাপ করত না। আমার তা কেমন যেন লাগত। একদিন এলম্‌হার্স্টকে† বললুম, "এটা কেমনতরো? লোকজন বাড়িতে আসে অথচ বিজয়া বের হয় না ওদের সামনে, ওরা ভাবে কী, যার বাড়িতে আসে, সে-ই বের হয় না।"

* মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। বুয়েনস আয়ারে গুরুদেব এঁর অতিথি ছিলেন। এঁকে "পূরবী" উৎসর্গ করা হয়েছে।

† শ্রীযুক্ত এল্, কে, এলম্‌হার্স্ট শান্তিনিকেতনে একজন কর্মী ছিলেন, ইনি গুরুদেবের সঙ্গে South Americaতে ছিলেন।

ঠিক তার পরদিন দেখি বিজয়া এসে দিব্যি হেসে ওদের চা খাওয়াচ্ছে। এতে করে হোলো কী, বিজয়া যাদের সামনে বের হয়, তারা পড়ে সংকুচিত হয়ে। তারা যেন জড়সড় হয়ে থাকে। বিজয়া আমার 'চাওয়া'র কাছে ওর সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করত।

বিজয়া খুব শিক্ষিতা মেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে আসত, আমার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করত। প্রায়ই আমায় বলত, কেন তুমি স্প্যানিশ ভাষা জানলে না, আমি যে সব কথা তোমায় ইংরেজিতে বোঝাতে পারিনে। আমারও দুঃখ হোত খুব, কেন স্প্যানিশ ভাষা শিখিনি কোনাদিন।

৭ই অগস্ট, ১৯৩৪

বাংলাদেশে বৌদি সম্পর্কটি বড়ো মধুর। এমনটি আর কোনো দেশে নেই। মনে পড়ে আমার নতুন বৌঠানের কথা,—খুব ভালোবাসতুম তাঁকে, তিনিও আমায় খুব ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসায় নতুন বৌঠান বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন। আমার সকল আবদারের ঐ একটি স্থান ছিল—নতুন বৌঠান। কত আবদার করেছি, কত যত্ন ভালোবাসা পেয়েছি।

১২ই অগস্ট, ১৯৩৪

মেয়েরা জন্মায় মায়ের পরিপূর্ণতা নিয়ে। দেখা গিয়েছে যেখানে মায়ের জোর বেশি, মা খুব সুস্থ সবল,

সেখানেই মেয়ে হয়েছে। তার আর-একটা কারণ আছে, মেয়েদের প্রাণ দিতে হয়—তাই সেই পূর্ণতা চাই।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় খুব স্পষ্ট জেনেছি মানুষ বুড়ো হোলে তার একটা-কিছু আঁকড়ে ধরবার স্বভাব হয়। আর বৌমাদের উপর একটা প্রবল স্নেহ, নাতনীদের উপর ভালোবাসা হয়। আমার নিজেরও হয়েছে তাই। বৌমাকে অনেকটা মার মতোই মনে হয়। মনে হয় ছোটো খোকার মা'র মতো আশ্রয় ওটা। সেই আশ্রয়টাই আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওটা ভালো নয়। ধরো না কেন, আমি এসে গেছি একেবারে এপারে, আর ওরা সব ওপারে। ওদের ইচ্ছে আছে, শখ আছে, সমস্তই আছে। আমার সঙ্গে সে-সবের খাপ খাবে কেন। এখন আমি যদি ওদের আঁকড়ে ধরি সেটা ওদের কাছে বন্ধনস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই অনেক সময়ে মনকে জোর করে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নিই, মায়া কাটাই।

... ...

আজ অনেকেই আমার ইদানিং-এর ছবি দেখে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেল।' আমার ইচ্ছে করছে সব ছেড়ে দিয়ে কেবল ছবিই আঁকি। জীবনে আজ আমার সত্যি যেন ছবি আঁকতে উৎসাহ হচ্ছে।

... ...

আর ভালো লাগে না আমার। অল্পেতেই মন পড়ে শ্রান্ত হয়ে। লেখা আর এগোয় না কিছুতেই। এত ক্লান্তি লাগে আজকাল লিখতে। এখন ইচ্ছে করে, সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে তাতে দিন কাটাই। সামনের লতাবিতানে বসি, তাতে একটি মাধবীলতা বেয়ে উঠবে, ভ্রমর গুন গুন করবে, সেই আলোছায়ার মাঝে বসে চারদিকের প্রকৃতির সব শোভা দেখি। আর যখন ইচ্ছে হবে, নিজের খেয়ালে ছবি আঁকব। এমনি করে আর যে-কয়টা দিন বেঁচে আছি, কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর! ১৯৩৪

—মুক্তি দে, তবে মুক্তি পাবি নিজের জন্যে কাউকে বাঁধতে চাসনে, তাহলে নিজেই তাতে বন্দী হবি।

... ...

স্ত্রীপুরুষে মিলন আজকাল একটি সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। খুব কম দেখা যায় যেখানে তারা সত্যিকারের মিলেছে। প্রায় সবেতেই একটা ভাঙাচোরার ভাব। এর মূলে হচ্ছে, এদের সহজ বিশ্বাসের ভিত্তিটা এরা হারিয়ে ফেলেছে—নষ্ট করে ফেলেছে। . . .

পুরুষকে কখনো নিজের কাছে আটকে রাখতে নেই। তাকে তার ইচ্ছেয়, তার কাজে ছেড়ে দিতে হয়, নইলে পুরুষ তার পৌরুষ হারিয়ে ফেলে।

... ...

ভালোবাসা দুই রকমের। এক হচ্ছে মনের গভীরতম দেশ থেকে ভালোবাসা, আরেকটি হচ্ছে শাসন ক'রে ভালোবাসা। কিন্তু কমনীয়তা থাকে সেই গভীরতায়।

. . .

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৫

বিকেলে "কঙ্করকুঞ্জে" গুরুদেব হিমঝুরি গাছগুলির তলায় সরু রাস্তাটিতে পায়চারি করছিলেন। সূর্যাস্তের আলো এসে পড়েছে গাছগুলির মাথায়। গুরুদেব মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন সেদিকে, গাছের পর গাছে সেই আলো যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। দেখে দেখে তিনি বললেন:

গাছগুলিতে সূর্যাস্তের আলো পড়ে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। পাতা ঝরবার সময় এল, সব পাতাগুলি হল্‌দে টস্‌টসে হয়ে আছে, তাতে আবার সূর্যের আলো কী চমৎকার মানিয়েছে। আমারি মতো ঝরে পড়বার আগে গায়ে অস্তরবির রশ্মি পড়েছে। যৌবনের চাইতে এর বাহার কি কোনো অংশে কম।

বলে হেসে তাকালেন; কিছুতেই হার মানবেন না—যৌবনের কাছে।

... ...

বাগানে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা তিনি পছন্দ করেন না, বলেন:

ঝরাপাতাও বাগান ও গাছের একটি অঙ্গ। আশ্চর্য হই যখন লোক তা পছন্দ করে না,—শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে বাগান পরিষ্কার রাখে। শুকনো পাতারও যে একটা ভাষা আছে।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

দুপুর বেলা, সবাই বিশ্রাম করছে। গুরুদেব একমনে লিখেই চলেছেন। মুখে ক্লান্তির ছায়া। অনুরোধ করলুম তাঁকে একটু বিশ্রাম নিতে। গুরুদেব কাজ ফেলে বিশ্রাম করতে স্বস্তি পান না। একবার কলমটি খাতার পাতায় রেখে খাতাটি বন্ধ করে চেয়ারে পিঠটা এলিয়ে দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন:

> আর পারি না রে। এবার তোরা আমায় ছুটি দে, বাইরে ঘোরা আমার কাজ নয়। সে তোমাদের কর্তারা করুক গে। আমি এই গাছপালা, রোদের আলোছায়া, পাখির কাকলী, এ নিয়েই থাকি। বেশ লাগে আমার ভাবতেও। তা না, আমায় নিয়ে শুধু টানাহেঁচড়া। কোথায় কী—এই দেখো না আবার যেতে হবে উত্তরে। বেশ ছবিতে মন দিচ্ছিলুম, বেশ কাটছিল সময়। লেকচার লেখা শেষ করে একটু ফাঁক পেলুম, ছবিও আসছে দু-চারটে, এক্ষুনি ছুটতে হবে, লেকচার দিতে হবে।—কী আর হবে—

বলে আবার খাতা খুলে কলম হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লাগলেন।

সন্ধেবেলা—আজ গুরুদেব বড়ো ক্লান্ত, সারাদিন লেখার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত। ইজিচেয়ারে পা লম্বা করে মেলে গা' এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন। এ সময়ে প্রায়ই তাঁর কাছে গিয়ে বসি—তিনি নানা গল্প করেন—বেশির ভাগ তাঁর জীবনের মধুর স্মৃতিকথাই বলেন। আজ কেমন যেন অন্য সুরে থেকে থেকে দু-চারটে কথা বললেন :

> আশ্চর্য এই—প্রত্যেকেই অনন্তকালটা নিয়ে বসে আছে। কেবল lifeএর কথাই ভাবছে। আর-একটা দিক কিছুতেই ভাবতে চায় না। এই “না-life” টার কথা

কেবলই ভুলে থাকতে চায়। নিজের মনে মানতে চায় না। অথচ তার অনন্ত কালটা তো আজও হোতে পারে, কালও হোতে পারে। সেটা মানতে এত ভয় বা আপত্তি কেন।

এই কথা বলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। গুরুদেব এই স্বরে কথা বললে কেন জানি বড়ো বুকে লাগে। সইতে পারি না। অন্য কোনো হালকা প্রসঙ্গও আজ তুলতে পারছি না—কেমন যেন সব সুর বদলে গেছে। খানিক বাদে তিনি আবার বললেন ঃ

মরতে আমার দুঃখ নেই। নিজের জীবনের জন্যে একটুও ভাবিনে। কারো জন্যও এতটুকু দুঃখ হবে না। কেবল ভাবি—এই যে পৃথিবীতে আমি এত ভালোবেসেছি এই তার গাছপালা আলোছায়া—

বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর ভারি হয়ে এল, কথা শেষ করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ কাটল এমনিই—আমার যে কী রকম লাগছিল তা' ব'লে বোঝাতে পারব না। গুরুদেব বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝলেন, ওমনি সহজ গলায় সহজ ভঙ্গীতে সহজ কথাবার্তা আরম্ভ করলেন।

অনেকদিন landscape করিনি। আমার আবার মজা হচ্ছে যখন যেটা ধরি সেটা নিয়েই মেতে থাকি। মুখ তো মুখই করি কেবল।

ছবির বিষয়ে কথাবার্তা হোলো আরো কিছুক্ষণ। ঠিক হলো, কাল সকালে তিনি একটি ছবি আঁকবেন নানা রং দিয়ে বড়ো একটা কাগজে। ছবি আঁকতে পেলে তিনি বড়ো খুশী হন।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

কোণার্কের পুবের বারান্দায় এসে গুরুদেব বসলেন। তাঁর শিমুলের

ডালে সবে ফুল ফুটেছে—সমস্ত গাছ কুঁড়িতে ভরে গেছে। ওদিকে পলাশের ডগায়ও রং ধরেছে। দেখে দেখে বললেন :

শিমুল, পলাশ ফুটতে আরম্ভ করেছে। বসন্তের শুরু হচ্ছে, আর এই সময়ে আমায় এসব ফেলে ছুটতে হবে। বেশ থাকতুম এখানে। এই ফুলফোটা, পাতাঝরার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমার কবিতাও লেখা হোত দু'চারটে। বেশ মাথায় আসত। এ যে গাছপালার মতনই সময় বুঝে আসে। তা না—কেবল আমায় নিয়ে টানাটানি। দে না বাপু, এই লোকটাকে এবারে ছুটি।

দুপুরে গুরুদেবের কাছে গেলুম। একটি কৌচে বসে একটা বিলিতী কাগজ পড়ছিলেন। ঘরে ঢুকতে কাগজটি উলটে কোলের উপর রেখে দিলেন। কাছে গিয়ে পায়ের কাছে বসলুম। নানা গল্প করলেন। সেই কাগজখানায় একটা কী প্রবন্ধ পড়ছিলেন—সে-কথা বলতে বলতে বললেন :

এই দেহ নিয়ে লোকে এত গর্ব করে কেন। অথচ এর ভিতরে কত dirty ব্যাপার। বেশ হয় যখন এ দেহ পুড়ে ছাইয়ে পরিণত হয়। ঠিক উপযুক্ত ব্যবস্থা।—

১৪ই জুন, ১৯৩৫ ; চন্দননগর

সংসারে মেয়েদের একটা মস্তবড়ো দাবি আছে যেখানে সে সমস্ত কিছুর জন্যে ভাববে, দেখবে, যত্ন নেবে। সেখানে যারা উদাসীন, আমি তাদের প্রশংসা করিনে। সেখানে তো আর পুরুষেরা ভাবতে পারে না, তাই মেয়েদের এটা মস্ত বড়ো কর্তব্যও।

... ...

দুপুরে প্রায়ই খানিকটা সময় কৌচে বসে নানা রকম বিলিতী কাগজ পড়েন। ঐটুকুই তাঁর বিশ্রামের সময়। কদাচিৎ কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বোজেন। তারপর আবার লেখার কাজে মগ্ন হন। আজ দুপুরে কাগজ পড়ছিলেন—আমি কাছেই ছিলুম, মৃত্যু সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ ছিল তাতে—কত রকমের মৃত্যু আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি সে সব পড়তে পড়তে বললেন :

মৃত্যুকে আমি ভয় পাইনে। যাঁরাই মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছেন, তাঁরাই বলেছেন, 'সে তো পাঁচমিনিট, তারপর সব শান্তি।' এই পাঁচমিনিট কি আর কষ্ট সহ্য করতে পারব না। নিশ্চয়ই পারব। ভয় পাই মৃত্যুটা যখন linger করে, তখন তাকে।

বিকেল

এত বলি, তবুও বসবে না, দাঁড়িয়ে থাকবে; যেমন রজনীগন্ধার পুষ্পবৃন্তটি উঁচু হয়ে থাকবে। কবিত্ব আছে এর মধ্যে। আর আমরা সব সময়েই বসে থাকি, নিজেকে যত পারি সংকুচিত করে রাখি। তোমার মতো তো চালাক নই, কী করব বলো।

... ...

চন্দননগরে গঙ্গার ধারে লালবাড়িতে গুরুদেব আমাদের নিয়ে আছেন। বাড়ির গা ঘেঁষে গঙ্গা তরতর করে বয়ে চলেছে। অতি সুন্দর দৃশ্য সব মিলিয়ে। গুরুদেব দিনের অধিকাংশ সময় বারান্দায়ই কাটান। অনেকদূর অবধি গঙ্গা দেখা যায়—তিনি সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন :

জলে হচ্ছে নৃত্য, পারে গর্জন, আর আকাশে

সংগীত। অবশ্য বলা যেতে পারে তাঁরে এই তিনই আছে।

... ...

ধরো না কেন, এই জলে কী একটা বিরাট ব্যাপার চলেছে, কত জীবজন্তু, কত হৈ চৈ। এই ডাঙায় যা আছে তার চেয়ে কতগুণ বেশি প্রাণী আছে জলের ভিতরে। কিন্তু দেখে কে বলবে। উপরে যেন একটি পর্দা টেনে রেখেছে, মনে হয় কী শান্ত এর ধারা। বলিহারি যাই মানুষকে, লজ্জাশরম এর কিছুই রাখলে না গো, এই আবরণ ভেদ করে জলের নিচে গিয়ে সব দেখেশুনে ফটো তুলে দিলে সব প্রকাশ করে।

... ...

সন্ধ্যা

পা-টেপানো একটা বদ অভ্যেস। এখন রোজ এই সময়টি হোলে আমার পা বলবে—কই আমার টেপার লোক কই। ভারি তো হয়েছেন 'পা', তার আবার অত কী। হাত হোলে বুঝতুম, মাথা হোলে বুঝতুম, যা হোক তাদের মেনে চলতে হয় বই কি। হয়েছেন 'পা', থাকো, জুতো প'রে ভদ্রলোক হয়ে থাকো—কথাটি কোয়ো না।

১৫ই জুন, ১৯৩৫, সকাল

আজ তিনচারদিন ধরে গুরুদেব সকালটা বাইরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোওয়া অবস্থায় বই প'ড়ে, গল্প ক'রে বা গঙ্গার শোভা দেখে দেখে কাটিয়ে দিচ্ছেন। তাঁকে এভাবে এতখানি সময় কখনো

বিশ্রাম নিতে দেখিনি। মাঝে মাঝে বলেন তাঁর জীবনের নানা ঘটনা, যখন যা ছবির মতো মানস চোখে ভেসে ওঠে। আজও অনেকক্ষণ নানা গল্প করবার পর বললেন :

দেখ্, ছেলেবেলা থেকেই আমার কেমন সন্ন্যাসীর জীবন। সেই কত অল্প বয়সে একেলা পদ্মার চরে ছিলুম। মাসের পর মাস কেটেছে, কারো সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইনি। আর সে সময় যত ভালো ভালো লেখা আমার বেরিয়েছে। চুপ করে ভাবলে লেখাগুলি বেশ পরিষ্কার আসে। আমি যখন চুপ করে থাকি, তখনো ক্রমাগত লিখে যাচ্ছি মনে মনে। দেখি এবার "শ্যামলী"তে* গিয়ে। চুপচাপ থাকব আর লিখব। লোকজন, ভিড় আমার ভালো লাগে না। শুনেছি, "শ্যামলী"র চারদিকে কঞ্চির বেড়া দিয়েছে, তাতে কুকুর আটকাবে কিন্তু ঠাকুর আটকাতে পারবে কি।

... ...

সকালে প্রায় রোজই আমাকে খানিকক্ষণ ইংরেজি পড়ান। আজ কয়েকদিন থেকে পড়ছিলাম Maxim Gorkiর "My University Days" বইখানি। এই বইখানি হাতের কাছে ছিল, তিনি বললেন "ভালোই হোলো এখানা আমার পড়া হয়নি, তোকে পড়াতে পড়াতে আমারও পড়া হয়ে যাবে।" আজ অনেকক্ষণ ধরে বইটি পড়া হোলো। গুরুদেব জোরে জোরে পড়ছেন আর আমি নিচে বসে তাঁর চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে শুনছি। পড়ার শেষে, আত্মচরিত লেখা কত কঠিন সে সম্বন্ধে নানা সুবিধা অসুবিধার কারণ বলে হেসে বললেন :

* গুরুদেবের প্রিয় মাটির বাড়ি "শ্যামলী" তখন তৈরি হচ্ছিল।

আমার জীবনচরিত কেউ লিখতে পারবে না। দেখ্ না তুই চেষ্টা ক'রে। এই ভাবে শুরু কর্—

ব'লে তিনি অতি বিশুদ্ধ ভাষায় দু-তিন লাইন কোথায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথঠাকুর জন্মেছেন সে-বৃত্তান্ত বলতে বলতে স্নিগ্ধ হাসিতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সেক্রেটারি সেদিনের ডাক, মানে এক গাদা চিঠি এনে তাঁর হাতে দিলেন।

. ...

সেদিনের খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কখন্ একসময়ে তিনি তন্দ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। খানিক বাদে জেগে উঠে চোখ মেলে বললেন:

এটা আমার কোনোদিন ছিল না। আজকাল এক-একদিন এমন কুঁড়েমি লাগে—সকাল থেকেই মন বলতে থাকে, "আজ আমার রবিবার, আজ আমার রবিবার।" বলি, আচ্ছা বাপু, তাই যেন হোলো। চুপ করে বসে থাকি খানিকক্ষণ, কখন্ দেখি জেগে, কোলে বই খোলা রয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম ব'লে আমার কোনো বালাই ছিল না, কী যে হয়েছে এখন। বয়স, বয়স, বয়স হয়েছে, এ যে আর ভুলবার জো নেই।

বিকেল

বারান্দায় চা খেতে খেতে গুরুদেব বললেন:

এই মুহূর্তে আমরা এই চন্দননগরে একটি কোণায় বসে আছি, তুমি আমার খাওয়া দেখছ; আর এই মুহূর্তে পৃথিবীর কত জায়গায় কত ঘটনা ঘটে চলেছে—কত যুদ্ধ, বিগ্রহ, জন্ম, মৃত্যু, ধ্বংস, গড়া, কত কিছুই না হচ্ছে।

১৬ই জুন, ১৯৩৫; চন্দননগর, সকাল

এই দেখ্ না কেন, আমাদের কালে যদি বৌঠানদের institutionটা না থাকত, তবে কী উপায় হোত আমাদের ভেবে দেখ্ দেখি। আমাদের কালে অন্য মেয়েরা সব কোথায় ছিল। বাড়ির বাইরে কোনো মেয়েদের সঙ্গে মিশবার আমাদের উপায় ছিল না। মেয়ে বলে জানতুম ঐ বৌঠানদের। ভালোবাসা, মান অভিমান দুষ্টুমি যা কিছু বল, ঐ বৌঠানদের সঙ্গেই ছিল সব। মনে পড়ে আমার নতুন বৌঠানকে। মজা এই দেখ্ না কেন, যাঁরা মরে যায়, তাঁদের আর বয়স বাড়ে না। নতুন বৌঠান—তাঁর আর বয়স হোলো না কোনোদিন।

দুপুরবেলা নতুন বৌঠানকে ইংরেজি পড়াতুম, কত সময়ে কত উপদ্রব করেছি। তিনি হাসিমুখে সে-সব উপদ্রব মেনে নিতেন।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫

বিকেলে চা খাচ্ছি ঘরে বসে, গুরুদেব এলেন। তাড়াতাড়ি চেয়ার এগিয়ে দিলুম, তিনি বসে আস্তে আস্তে গেয়ে উঠলেন:

ঘর করিনু বাহির
বাহির করিনু ঘর;
পর করিনু আপন
আপন করিনু পর।

গাইতে গাইতে তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ হোলো। তিনি বলতে লাগলেন:

অনেকদিন থেকেই আমার এই শুরু হয়েছে। আপনকে অনেকদিন হোলো পর করেছি। এখন আমার মন হয়েছে—যেমন অস্ত যাবার মন। এখন অস্ত যেতেই ইচ্ছে করছে। আস্তে আস্তে সব আত্মীয়তা নিজের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। এখন চাই যেন একবার ঘুমিয়ে পড়ি আর না উঠি। সেই হোলেই বেশ হয়। নির্বিঘ্নে আপদ কেটে যায়। তারপরে তাই নিয়ে যেন একটা হৈ হৈ ধুমধাম ব্যাপার না করে। আমার ইচ্ছে, ছাতিমতলায় আমার বড়দা'র যেমন হয়েছিল, তেমনি—। চুপেচাপে শান্তভাবে সব কাজ যেন সারা হয়। বড়োজোর হাজার খানেক টাকা কোনো ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ্ দেয় আমার নামে। ব্যস্—এই আমি জানিয়ে যেতে চাই সবাইকে। বলে গেলুম তোমায়, সময়মতো সবাইকে জানিয়ে দিয়ো।

আর কোনো কথা বললেন না, সেদিন আর বেশিক্ষণ বসলেনও না, উঠে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

১৪ই জুলাই, ১৯৩৭

জীবনের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। কিছুই ভালো লাগে না। অথচ এদের আবদারের শেষ নেই। আজ এটা চাই, কাল ওটা করে দাও, এ কি আর ভালো লাগে। ছবি আঁকতে পারতুম তো বেশ হোত। এই গাছপালায় রোদ ঝিকমিক করছে, পাখি ডাকছে—।

... ...

একদিন তোমার খোকার মতনই অশান্ত দুর্দান্ত

ছিলুম, হাত পা ছুঁড়তুম, চীৎকার করতুম। তখন যেমন অসহায় ছিলুম, আজও তেমনি অসহায় মনে হচ্ছে। একটু চলতে গেলে ভেঙে পড়ি—বুঝতে পারি সময় হয়ে এসেছে। অথচ এই যে বয়সের বেগ, এটা আস্তে আস্তে আসে না, যখন আসে তখন হুড়মুড় করে আসে। এই দু'তিন বছর হোলো বুঝতে পারছি এর আসা শুরু হয়েছে। এবার যাবার পালা, সব কিছু ফেলে দিয়ে এবার যেতে হবে।

১৫ই জুলাই, ১৯৩৭

এগোতে আর পারছিনে আজকাল। চলার শক্তিও অচল। একজায়গায় এসে ঠেকে গেছি, বসে গেছি। এমনি করে একদিন কাটবে, ভাবতেও পারিনি।

... ...

১লা জানুয়ারি, ১৯৩৮

বিকেলে কোণার্কের পশ্চিমদিকের বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছেন। অনেকক্ষণ বাগানেই বসে কথাবার্তা বললেন। যাবার সময়, কাঁকর-বিছানো রাস্তায় এক জায়গায় ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়ে খানিকটা জায়গা ঢালু হয়ে গিয়েছিল সেখানে পা পড়তেই গুরুদেব টাল খেতে খেতে কোনো রকমে সামলে উঠলেন। হাঁটবার সময় ঝুঁকে প'ড়ে এত তাড়াতাড়ি হাঁটেন, ভয় করে, এক-এক সময়ে মনে হয় হুমড়ি খেয়ে পড়েন বুঝিবা। অভিমান করে বললুম, কেন কিছুতে ভর দিয়ে চলেন না। সস্নেহে হাতখানি আমার কাঁধে রেখে বললেন:

ভর দিয়ে চলতে বলছ—যাঁকে ভর দিয়ে চলতে পারতুম, তাঁকে এখন কোথায় পাই বলো ?—

... ...

আমি হলুম শ্যামলা ধরণীর বরপুত্র। শ্যামল মাটির সঙ্গেই আমার সম্পর্ক বেশি। সেখানেই আমার গভীর টান। আমার কি সাজে দালানে বাস করা। আমার এই মাটির বাসায় মাটি হয়ে থাকব, একদিন মাটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাব—এই-ই ভালো। আগে থেকে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ করে নিই।

৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৮

সকালে বাইরে বসেই লিখছিলেন—অন্যান্য দিনের মতো। বেলা হয়েছে, যে-ছায়ায় বসেছিলেন, সে-ছায়া অন্য দিকে ঘুরে গেছে, মুখে রোদ এসে পড়েছে। তাঁকে বললুম, ভিতরে গেলে ভালো হয়। তিনি হেসে মুখ তুলে বললেন:

সূর্যের উপাসক আমি। সূর্যকে নইলে আমার চলে না। এই যে আমার মুখে রোদ্দুর এসে পড়েছে—বেশ লাগছে। দিনের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের সঙ্গে আমার মুখোমুখি করতেই হয়।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৩৮

আমার শিশুপুত্র অভিজিতকে রোজই সকালের দিকে খানিকক্ষণ কাছে নিয়ে আদর করতেন। প্রতিদিনই শিশু অভিজিত পৃথিবীতে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে—প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ তার ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে—শিশুজীবনের এই লীলা গুরুদেবকে আকৃষ্ট করত। গুরুদেব কত সময়ে দূরে বসে বসে ওকে দেখতেন, বলতেন:

এই তো, এমনি করেই জীবন শুরু। সবে বুদ্ধি খুলছে। কাক দেখে কা কা করে। এমনি করে আস্তে

আস্তে brain কাজ করবে। কী যে ভাবে ওরা এইটুকু মাথায় সারাদিন। টলমল করে চলছে, এই পা'ও একদিন শক্ত হবে, সোজা চলতে পারবে। অভিজিত নাম, সিদ্ধি জয় করবে।

কত যে স্নেহমাখা সুরে বললেন কথাটি।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৮

বসে বসে চিরকাল লিখে যাওয়ার দরুন ক্ষতি হয়েছে শুধু পায়ের। এখন আর চলতে চাইলে তারা নারাজ। চলতে গেলে পায়ে ভর রাখতে পারিনে, টলমল করি।

... ...

ভালো লাগে না দেখতে গুরুদেব যখন তাঁর মাথার অত সুন্দর চুলের গুচ্ছ থেকেথেকে ছেঁটে ফেলেন। তাঁর চুলে তাঁর যেন কোনো অধিকার নেই এমনিই ভাবখানা ছিল আমাদের। হঠাৎ হঠাৎ এক-একদিন যখন তাঁর চুলের এই অবস্থা দেখতুম, অভিমান অনুযোগের অবধি থাকত না। সেদিন তাঁর ঘরে ঢুকতেই গুরুদেব দু-হাতে ঘাড়ের কাছে হাত বুলোতে বুলোতে—আমি চেঁচামেচি করবার আগেই—বলে উঠলেন :

মাথার চুল কেটে বোঝা কমিয়েছি। অকারণে মাথায় বোঝা বয়ে বেড়ানো কি বুদ্ধিমানের কাজ। আর আমার মাথার গড়নও তো আর খারাপ নয় যে, ঢেকে বেড়াতে হবে। কী বলিস।

বলব আর কী। কিছু বলবার আগেই তো কৈফিয়ৎ দিয়ে দিলেন। মুখ ভার করবারও অবসর পেলুম না।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৮

বিকেলে বাগানে বসে গল্প হচ্ছিল। আধুনিক আবহাওয়ার কথা হোতে হোতে তিনি এক জায়গায় বললেন:

আজকাল ছেলেদের মধ্যে একটা রব শুনছি—"আমরা তরুণ।" তারা এমন ভাব দেখায় যেন এই তরুণই আমাদের সব কিছু। এরা এমন একটা কাজ করছে,—এরাই আমাদের ভারত উদ্ধার করবে, এরাই এক-একজন মহান ব্যক্তি। এই তরুণদের কাছে আর কেউ লাগে না। আরে বাপু—তরুণ তো সবাই হবে, সবাইকে তো এই তরুণে আসতেই হবে; এটা তো আর নতুন কিছু নয়। তবে এই নিয়ে এত হৈ হৈ কেন। আমরাও তো এককালে তরুণ ছিলুম, তাতে কিন্তু এত তারুণ্য ছিল না।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৮

সকালে কিছুক্ষণ লিখবার পর খাতাপত্র বন্ধ করে সেই টেবিলের সামনেই কোলের উপর হাত দুখানি রেখে স্থির হয়ে বসে আছেন, বাইরে যেখানে লাল কাঁকরবিছানো সরু রাস্তাটি দু-পাশের গাছগুলির আলোছায়ায় ঝলমল করছে, সেদিকে তাকিয়ে। গুরুদেবের ধারণা তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে, দূরের জিনিস তেমন পরিষ্কার দেখতে পান না আজকাল। প্রায়ই এজন্য তিনি বিষণ্ণ হয়ে থাকেন। আগে আগে কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখলে, আকাশে ঘন মেঘ করে এলে ছুটে গিয়ে গুরুদেবকে খবর দিতুম। কতদিন মুখ নিচু করে ঘরের ভিতরে লিখেই চলেছেন—আমার উৎসাহ দেখে বাইরে বেরিয়ে আসতেন, বা হয়তো জানলার কাছে সরে বসতেন। আকাশের ঘন মেঘের উপর রোদ্দুরের

সোনালী লাইন, কালবৈশাখীর আসন্ন আগমন, কৃষ্ণচূড়ার বিস্তীর্ণ লাল রঙের ছটা, মেঘের গায়ে লম্বা লম্বা হিমঝুরি গাছের চূড়াগুলি তাঁকে সর্বদা মুগ্ধ করত, চোখেমুখে খুশির আভাস ফুটে উঠত। কিন্তু আজকাল আর ডেকে তাঁকে কিছু দেখাইনে। দ্বিধা হয় মনে, সত্যিই যদি উনি চোখে কম দেখে থাকেন, তবে ঠিক জিনিসটি না দেখার দরুন মনে যে ব্যথা পাবেন। আজ বললেন :

পা অচল, কানে দোষ, চোখ ক্ষয়ে আসছে, আর বেঁচে থেকে লাভ কী বল্। শরীর অক্ষম হবার আগেই যাওয়া ভালো। এমনি করে এই অক্ষম দেহ টেনে বেড়ানোয় কী লাভ। ছুটি, ছুটি চাই, কবে যে ছুটি পাব জানিনে। কাজ করেছি তো ঢের; এবারে চাই পূর্ণ বিশ্রাম।—

... ...

দুপুরবেলা গুরুদেব ইজিচেয়ারে বসে আছেন, ডান হাতখানি কোলে এলানো; চেয়ারের হাতলের উপর কনুই ভর দেওয়া বাঁ হাতখানি থুঁতির নিচে; মৃদুমৃদু পা নাড়তে নাড়তে চোখ বুজে কী যেন ভাবছেন। পা নাড়ার লক্ষণ দেখে বুঝলুম তিনি ঘুমোননি, কাছে গিয়ে বসলুম। গুরুদেব বললেন :

"আচ্ছা রানী, বল্ দেখিনি; ধর্ তোর মৃত্যুর পরে—মরতে তো তোকে হবেই একদিন,"—

ঘাড় নেড়ে হাসিমুখে জানাই সে তো নিশ্চয়ই। তিনিও হেসে বললেন:

আচ্ছা, তাহলে তোর মৃত্যুর পরে, অবশ্য মৃত্যুর পরে কিছু আছে কিনা জানিনে; ধর্ যদি কিছু থাকে, আর যদি কিছু পুণ্যি করে থাকিস সেই জোরে বিধাতা

যিনি, তিনি যদি তোকে বর দিয়ে বলেন—'এবারে পুরুষ কি, নারী তোমার ইচ্ছেমতো জন্মগ্রহণ করো,' তাহলে তুই কোন্‌টা বেছে নিস।

আমি একটু ভেবেই বললুম, "কী জানি, পুরুষ হয়ে তো জন্মাতে ইচ্ছে করছে না। গুরুদেব বললেন:

আশ্চর্য করলি আমায়। নারীজন্মে এমন কী পেলি। সুখসৌভাগ্য কাজকর্ম কতটুকু সীমাবদ্ধ। কোনো দিকেই তো তোদের মুক্তি নেই, তবু বলবি, 'মেয়ে হয়েই জন্মাই যেন!' কিসের জন্য,—কী সুখ পেয়েছিস নারীজন্মে। আমায় ভাবনায় ফেললি যে।

বলতে বলতে বললেন :

মেয়েদের কাজে এত বাধাবিঘ্ন, তাদের আছে ঘরকন্না, তাদের আছে মাতৃত্বের গৌরব। যে যা-ই হোক না কেন, এ-সবের হাত থেকে কোনো মেয়ের রেহাই নেই। আমি এ-কে খারাপ বলছিনে, এরও একটা দাম আছে; কিন্তু কোনো মেয়ে তার প্রতিভায় দশজনের একজন হয়েছে, খুব কম দেখা যায়। হাজার হোক এটা মানতেই হবে, পুরুষের ও মেয়েদের build সব দিক থেকেই আলাদা। পুরুষের brain, তার শক্তি ঢের বেশি মজবুত। ধর্ না কেন, আমি যদি আমার ন'দিদি হতুম তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম। সংসারের বাধাবিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হোলেও মেয়েদের brain এতটা কাজ করতেই পারে না।

... ...

মেয়েদের নিজেদের প্রতিভাকে ফুটিয়ে তোলার আগ্রহ ও আনন্দ বিয়ের আগে পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু বিয়ের পরে তাদের সেই আগ্রহ বা আনন্দ তাতে পাওয়া যায় না। সব সেই এক ঘরকন্নায় তলিয়ে যায়। এ বড়ো আশ্চর্য।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৩৮

গুরুদেব আজ সকালে বাইরে শিমুলতলায় এসে বসেছেন। অভিজিত ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে কাঁকরের উপর দিয়ে টুকটুক করে হেঁটে তাঁর কাছে আসছে। খালি পায়ে কাঁকর ফুটছে, পা তুলে তুলে সে পা ফেলছে। ভঙ্গী দেখে গুরুদেব হেসে উঠলেন। তিনি বলতেন ছেলেবেলা থেকেই সব রকম অভ্যেস করানো ভালো, তাহলে শিশুরা মজবুত হয়ে গড়ে ওঠে। আজও অভিজিতকে দেখে সেই কথাই হোতে হোতে বললেন:

ছেলেরেলায় আমরা যে কী অবস্থায় মানুষ হয়েছি—কল্পনা করতে পারিসনে। গরিবভাবে দিন কাটিয়েছি। বাবুয়ানার নামগন্ধও ছিল না। প্রথম যখন জুতো পায়ে দিই, তখন বোধ হয় বারো বছর বয়স আমার। জুতো পায়ে দিয়ে মনে হোলো যেন কেউকেটা হয়ে গেছি একজন। নিতান্ত সাদাসিধে জীবন ছিল। আমি রথীকেও মানুস করেছি তেমনি করে।

... ...

অনাবশ্যক শোভার জন্য যে ঘরে জিনিসপত্র রাখা, তা আমার একটুও ভালো লাগে না। আমার এই মেটে ঘরই ভালো। দুখানা মাটির আসবাব—কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৮

লেখার টেবিলে বসে লিখছিলেন; একবার মুখ তুলে চারদিক তাকিয়ে হাতের কলমটির মুখে খাপ পরাতে পরাতে, চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে বললেন:

এত সুন্দর সন্ধে করেছে আজ অথচ দেখ্ না আমি এ উপভোগ করতে পারছিনে। কেবলই কাজের চাপ। একটা ফুরোয় তো আর-একটা আসে।

কী সুন্দর ছিলুম ছেলেবেলায়, কোনো কাজের চাপ ছিল না। সন্ধে হোত পশ্চিমদিক রাঙা হয়ে। পুকুরের পাড়ে বসে থাকতুম, হাঁসগুলো পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পাড়ে উঠে আসত, মেয়েরা জল তুলত; একমনে দেখতে দেখতে তাতে তন্ময় হয়ে যেতুম। কেমন সুন্দর ছিল সে সব কাল—

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩৮

ইতিমধ্যে গুরুদেবের পরপর দুখানা বাড়ি হয়েছে—"শ্যামলী" ও "পুনশ্চ"। বাড়ি তৈরি হবার আগে হতেই যাতে বাড়ি থেকে দূর দিগন্ত চারদিকের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যায় সেই বুঝে বাড়ির জন্যে জায়গা বাছাই করেন। দরকার পড়লে গাছপালা কাটিয়েও ফেলেন। "শ্যামলী"র দেয়াল উঠবার আগেই পশ্চিমদিকের সূর্যাস্ত দেখবার বাধাস্বরূপ মৃন্ময়ী বাড়িটা ভেঙে ফেলা হোলো। পূর্বদিকের দু-একটা মহানিমগাছও কাটা পড়ল। গুরুদেবের মজা হচ্ছে এই, বেশিদিন এক বাড়িতে থাকতে পারেন না। কিছুদিন বাদেই মন খুঁতখুঁত করে। হয় বাড়ি বদলান, নয় নতুন বাড়ি তৈরি করান। অথচ প্রত্যেক বারই বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, "এই-ই আমার শেষ বাড়ি।" আমাদেরও

খুব মজা লাগে—জানি তো তাঁকে। মাঝে মাঝে এ নিয়ে হাসাহাসিও করি। কিছুদিন থেকে গুরুদেব আবার একটি নতুন বাড়ির জন্যে জল্পনা কল্পনা করছেন, বিকেলে পায়চারি করবার সময় এদিক ওদিকে বাড়ির জন্য জমি বাছাই করেন। আজও তেমনি পায়চারি করতে করতে পছন্দসই জমি বাছাই করতে না পেরে বললেন:

আমার আর-একটা বাড়ি হবে। বাড়ির জন্য এবারে আর জায়গা ঠিক করা হবে না। আগে বাড়ি হোক—তারপর জায়গা ঠিক করা হবে বাড়ির অনুযায়ী।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩৮

বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে কোণার্কের বারান্দায় এসে চেয়ারে বসলেন। এইটুকু হেঁটে আসতে আজ তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল, বললেন:

বুকটা একটুতেই ধড়ফড় করে। হৃদ্‌যন্ত্রটা আমার একেবারেই ভালো না। হৃদয়টা আমার বড়ো দুর্বল, তা'তো তোরা জানিস'ই—

ব'লেই চোখ টিপে হেসে তাকালেন। কথার সুর কোত্থেকে কোথায় এল।

... ...

গলা এককালে ছিল বটে। গাইতেও পারতুম, গর্ব করবার মতন। তখন কোথাও কোনো মিটিং-এ গেলে সবাই চীৎকার করত, 'রবিঠাকুরের গান, রবিঠাকুরের গান' বলে। আজকাল রবিঠাকুরের গান বলতে বোঝায় তার রচিত গান—গীত নয়। তোমরা আমায় এখন একবার গাইতে ব'লেও সম্মান দাও না।

যখন গাইতুম তখন গান লিখতে শুরু করিনি তেমন, আর যখন গান লিখলুম তখন গলা নেই।

... ...

চিত্রাঙ্গদা যে কেন লিখি তার কোনো বিশেষ কারণ নেই। হঠাৎ একদিন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় যাচ্ছি, ন'দিদি বোধ হয় সঙ্গে। জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হোলো যে, নিজের রূপের উপর ঈর্ষান্বিত হওয়া, নিজের সৌন্দর্যকে দিয়ে একজনকে পেতে হোলো, যা নাকি তার নিজের নয়, এই যে সেই সৌন্দর্যের 'পরে একটা হিংসা, এটা ফুটিয়ে তুলে একটা গল্প লিখতে হবে। তারপর উড়িষ্যায় যখন জমিদারিতে যাই তখন এটা লিখি। আর কী রকম হুড়মুড় করে যে লিখেছি, তা বলতে পারিনে। লেখা যেন একেবারে হুড়হুড় করে এসে পড়েছিল, সামলানো দায়।—

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৩৮

বিকেলে দেখি গুরুদেব জমকালো বাসন্তী রঙের সিল্কের জোব্বা পরে বাইরে চেয়ারে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে আছেন। তার উপর শেষ-রবির রশ্মি প'ড়ে তা আরো যেন ঝলমল করছে। এ যে কী রূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁকে তাঁরাই শুধু অনুমান করতে পারেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে কাছে গিয়ে জোব্বাটি ধরে বললুম—বাঃ বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে এই সময়ে এই সাজে। কিন্তু হঠাৎ আজ—

বাসন্তী রঙের জামা পরেছি কেন। আমি যদি বসন্তকে আহ্বান না করি তো করবে কে বল্। বসন্তকে

তাই আহ্বান করছি। এবারে তার আসবার সময় হয়েছে। আমাকেই সবাইকে ডেকে আনতে হয়। এই দেখ্ না, বর্ষাকে ডাকি, তবে সে আসে। আবার থামাতেও হয় শেষে আমাকেই।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮

আজ সকাল থেকে গুরুদেব ছবিই আঁকছেন। এরি মধ্যে দুখানা ছবি আঁকা হয়ে গেছে। আর-একখানা শুরু করলেন। ছবি আঁকতে পেলে বড়ো খুশিতে থাকেন; এমনই ভাব করেন যেন একটা খেলা করবার অবসর মিলেছে তাঁর। ছবি আঁকতে আঁকতে বললেন:

আমার ছবি আঁকতে এত ভালো লাগে অথচ আমায় এরা ছবি আঁকতে সময় দেবে না। কেবলি ফরমাশ করবে এটা করো ওটা করো। আমি যখন ছবি আঁকি এত ভালো লাগে—

এ ছবিখানাও প্রায় শেষ হয়ে এল। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মজা করে বলতে লাগলেন:

আচ্ছা ধর্, পাঁচ-শ ছ-শ বছর পরে আমার ছবি, আমার কবিতা নিয়ে কেমন আলোচনা হবে আন্দাজ কর্ তো। হয়তো একদল লোক কেবল এই নিয়েই রিসর্চ করবে। কেউ হয়তো বলবে সেই সময়ে এক দেবতার পুজো হোত সূর্যও বলতে পারো, রবীন্দ্র—রবি ইন্দ্র। বলবে হয়তো সে-সময়ে সবাই সূর্য-উপাসক ছিল। গান কবিতা লিখে তাঁর পুজো হোত। আমার ছবিগুলোকে হয়তো বলবে এগুলো এক-একটা "সেরিমোনিয়াল"

ব্যাপার। ছবি এঁকে এঁকে রবীন্দ্রকে উৎসর্গকরা হোত ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাসতে হাসতে বললেন:

তুই একটা লেখ্ না এই সম্বন্ধে।

... .

বিকেলে কোণার্কের বারান্দায় এসে বসলেন। আজ তাঁর চোখে-মুখে বড়ো খুশির ভাব—দু-চোখ মেলে যা দেখছেন তাতেই যেন আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন। বললেন:

আমি যে বেঁচে আছি, তা কেবল এই পৃথিবীকে ভালোবেসেছি ব'লে। এত ভালোবেসেছি যে, বলতে পারিনে। প্রকৃতির আলো, বাতাস, গাছ, পাখি সব যে কী ভালোবেসেছি; কী অপরিসীম আনন্দ পাই, তা কতটুকু প্রকাশ করতে পারি। প্রকৃতি আমার চোখে যে কী রূপ তার মেলে ধরে—তাতে আমি ডুবে যাই। শীতের সকালে যখন রোদ এসে "উদয়নে" পড়ে, আমার মনে হয় যেন এটা একটা fairyland. চারিদিক সোনালী রঙে ঝিকমিক করতে থাকে। মনে হয় যেন কেউ সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। চারদিকের সেই রূপে মনপ্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। কতটুকু তার প্রকাশ করতে পারি বল্। তাই তো বলি, বিধাতা একদিক দিয়ে দিতে আমাকে কার্পণ্য করেননি। এত দিয়েছেন —ঢেলে দিয়েছেন আমায়। যাবার সময়ে এই কথাই বলে যাব যে, ভালো লেগেছিল, ভালো বেসেছিলুম

পৃথিবীকে, এমন ভালো কেউ কোনোদিন বাসতে পারে না।—

১লা অগস্ট, ১৯৩৮

সকালে পুনশ্চতে গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেলুম। কাল বিকেল থেকে অসহ্য গুমোট করেছে। কোনোদিন গুরুদেবকে গরম সম্বন্ধে অনুযোগ করতে শুনিনি। দারুণ গ্রীষ্মের তাপে চারদিকের গাছপালা যখন ঝলসে যাচ্ছে, কুয়োর জল শুকিয়ে যাচ্ছে, সকাল থেকে সবাই দরজা জানালা বন্ধ করে ছটফট করতে করতে মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছি, তখনো গুরুদেবকে দেখেছি দরজা-জানালা খুলে নির্বিকার মনে লিখেই চলেছেন। বরং বাইরের তাপ যত বাড়ত, তত তিনি মোটা মোটা জোব্বা পরতেন। এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে উলটে তিনি আরো বোঝাতেন যে, এ সময়ে মোটা কাপড় ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ তাহলে বাইরের গরম হাওয়াটা মোটা কাপড় ভেদ করে গায়ে লাগতে পারবে না। আমরা শুনে মনে মনে হাসতুম বটে; কিন্তু ওঁর এই সহন শক্তি আমাদের অবাক করে দিত। আজকাল আর গুরুদেব গরম তেমন সইতে পারেন না, এমন কি, এক-এক সময়ে তাঁর রীতিমতো কষ্টই হয়। বললেন :

কাল রাতে খুব গরম পড়েছিল এবং সেটা বেশ দস্তুরমতো বোধ করিয়ে তবে ছেড়েছিল। ছটফট করিনি, জানি তাতে কোনো লাভ হবে না। নালিশও করিনি, নালিশে নালিশই শুধু বেড়ে যায়, কাজ হয় না তাতে। মনে হচ্ছে পৃথিবী ঘোমটা টেনে আসছে। সূর্যদেব যদি তাঁর ঘোমটা খোলেন তাতেও লাভ নেই, গরম তো তাতে আরো বাড়বে বই কমবে না।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

অভিমান করিসনে, তোদের আমি দূরে সরিয়ে রাখি নে, রাখতে চাইওনে। আমিই আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি সব জায়গা থেকে। যাবার সময় তো হোলো, কী হবে আর নিজেকে জড়িয়ে রেখে। তৈরি হয়ে থাকি, যখনি সময় হবে যেন টুক করে যেতে পারি। তাই বাঁধন সব আলগা করে রাখছি। আর কতকাল—অনেক তো হোলো—অনেক তো করেছি, গেয়েছি; এবার বলি, তুলে নাও।

৪ঠা মার্চ, ১৯৩৯

কিছুদিন থেকে চোখ নিয়ে গুরুদেব বড়ো ভাবনায় পড়েছেন। থেকে থেকে চশমা বদলাচ্ছেন—নানা রকম ওষুধ লাগাচ্ছেন। সম্প্রতি একটা ওষুধ রোজ ড্রপার দিয়ে দিনে দু-তিনবার করে তাঁর চোখে ঢেলে দিই। বেশ জ্বালা করে, অনেকক্ষণ অবধি চোখ লাল হয়ে থাকে। ওষুধের শিশি এক হাতে আর এক-হাতে ড্রপারে ওষুধ নিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে, মাথাটি চেয়ারের উপর হেলিয়ে দিতে দিতে বললেন:

এসেছ তুমি আমার অশ্রুপাত করাতে। আমার চোখের জল ফেলিয়ে তুমি কী সুখটা পাও, বলো দেখি।

চোখে ওষুধের ফোঁটা পড়তেই কেমন যেন একটু শিউরে ওঠেন। তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে বললেন:

চমক লাগিয়ে দেয় গো, চমক লাগিয়ে দেয়।

হাতে রুমাল তুলে দিতে, রুমাল দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বললেন:

রূপে নয়, ওষুধের জ্বালায়। ওষুধের ঝাঁজ কী, শত্রুর দিকে তাকিয়ে থাকলেও এত জল পড়ে না।

একটু পরে চোখছুটির জ্বালা একটু কমতে ভালো করে তাকাতে তাকাতে বললেন :

হয়তো হবে উপকার একটু ; একটু হয়তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। চোখ গেলে তো আমার চলবে না। এ ছুটিকে সযত্নে রাখতে হবে। ভগবান হয়তো এত নির্দয় হবেন না আমার প্রতি। যে-চোখ দিয়ে তাঁর যা-কিছু দেখেছি, খুশী হয়েছি, তাঁর গুণগান করেছি। খোশামোদ তাঁকে তো কম করিনি, খুশীও হয়েছেন নিশ্চয়ই।

একটু হেসে বললেন :

কবিদের মতন ; খোশামোদ পেলে সবাই খুশী হয় দেখছি।

... ...

কাল অভিজিত একসময়ে কখন্ কয়েকটি সাদা পোস্টকার্ডে ছবি এঁকে গুরুদেবকে দিয়ে এসেছিল। সেগুলো তাঁর টেবিলের পাশেই আছে। এখন আবার ছবিগুলো হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন :

তোর ছেলের ছবি-আঁকা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। ও-ছেলে একটি আর্টিস্টের মতন আর্টিস্ট হবে। এরই মধ্যে কেমন একটা রূপের আকার দিতে শিখেছে। আমি নিশ্চয়ই বলছি, ও আর কিছু হোক না হোক, লক্ষ্মীছাড়া আর্টিস্ট হবে ঠিকই। অবশ্যি তাতে করে লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকতে পারে।

অনেক সময় ছোটো ছেলেদের ছবি অবাক করে দেয়। এখানেই এই শিশুবিভাগের ছোটো ছেলেদের আঁকা কয়টা ছবি আমায় আশ্চর্য করে দিয়েছে। এ জায়গায় গড়ে ওঠার মধ্যে অনেকখানি সম্পূর্ণতা আসে আপনা হতেই।

তারা আপনিই গড়ে ওঠে। এক-এক সময়ে মনে হয় যদি এমনি আবহাওয়া আমরা ছেলেবেলায় পেতুম, হয়তো বা একজন আর্টিস্ট হোলে হোতেও পারতুম। হাসছিস? না, সত্যি দেখ্ না—ছেলেবয়সে যখন শীতের সকালের রোদ্দুর প'ড়ে নারকেল গাছের পাতাগুলি ঝলমল করত, গায়ের কাপড় একটানে ফেলে দিয়ে হুড়মুড় করে বাইরে যেতুম তাই দেখতে। আর কী অসম্ভব খুশী হতুম। সকালে কী তাড়াহুড়োই করতুম, পাছে সে-শোভা miss করি ব'লে। তখন সত্যিই চোখের খিদেটা তো হয়েছিল। সে সময়ে যদি কেউ রং-তুলি নিয়ে একটু বাতলে দিত। তাই বলি, এখানকার এই আবহাওয়া অনেকটা সাহায্য করে নিজেদের প্রকাশ করতে।

... ...

দুপুরে শ্যামলীতে গিয়ে দেখি গুরুদেব একটা কৌচে বসে বাঁধানো হলুদ রঙের খাতাটি খুলে হাতে নিয়ে গুনগুন করে একটি গানে সুর ধরছেন। বললেন:

সকালে বসেছিলুম, গুনগুন করে মাথায় গান আসছিল; বেশ মজে গিয়েছিলুম। এমন সময়ে '—'এল, '—'কে নিয়ে। অনেকক্ষণ বসেছিল, আমারও গানটান সব কোথায় এলোমেলো হয়ে গেল। আর কিছুতেই তাকে আনতে পারছিনে। এখন আর ভালো লাগে না কিছুই। ছুটি, ছুটি চাই এবারে। এই তো এইটুকুতেই তো আমার সুখ; একটু গান, একটু ছবি, একটু কবিতা। আর তো আমি কিছুই চাইনে।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

মরে যাবার পরেও লোকে কেন যে কামনা করে, তাদের নিয়ে হৈ-চৈ হোক, তাদের লেখার, কীর্তির গুণ-গান হোক। এত বড়ো মূর্খতা এই মানুষেরাই করে। এর চাইতে বড়ো বোকামি আর কিছুতেই হোতে পারে না। আরে, মরেই যদি গেলুম, তারপর তা নিয়ে কী হোলো না হোলো, তা নিয়ে কী এল আর গেল। লিখছি, নিজে আনন্দ পাচ্ছি; এই তো যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশি চাওয়া আর কাকে বলে।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

গুরুদেবের প্রাতরাশের টেবিলের পাশে আমরা জড়ো হয়েছি। আজ তিনি খুব প্রফুল্ল, কথায় কথায় হাসিতামাশায় মাতিয়ে দিচ্ছেন। সেক্রেটারি টেবিলের পাশে গুরুদেবের একটি ফটো রেখে দিলেন, কেউ একজন তাতে গুরুদেবের সই নেবার জন্যে পাঠিয়েছেন। ফটোখানিতে গুরুদেবের মুখে আলো-ছায়াতে বেশ একটা ভাব ফুটেছে। গুরুদেব সেখানি হাতে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে গম্ভীরমুখে বললেন:

আমার এই ফটোটায় ওরা কেউ কেউ বলে রোদ্দুর পড়ে এমনি হয়েছে! তাই কি! আমি বলি ও আমার জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। এ কি আর সবার ছবিতে হয়। হবে কি তোমার ফটোতে।

ব'লে হেসে সেক্রেটারির দিকে কটাক্ষপাত করলেন। সেক্রেটারি গর্বের সঙ্গে বলে উঠলেন—"জানেন, আমার ফটো তুলে শম্ভুবাবু বিদেশে কম্পিটিশনে প্রাইজ পেয়েছেন।" গুরুদেব চোখ বড়ো বড়ো করে কপাল টানা দিয়ে বললেন :

বটে! এটা prize না হোক, আমার কাছে surprise তো বটেই।

ব'লে হো হো করে হেসে উঠলেন।

?। মার্চ, ১৯৩৯

বিকেলে কঙ্করকুঞ্জের হিমঝুরি সোনাঝুরির গাছতলায় ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাত দুখানি পিঠের দিকে। এ-ছায়া থেকে ও-ছায়ায় যাচ্ছেন, কখনো বা দাঁড়িয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে সে-সবের শোভা দেখছেন। বললেন:

আমি ভালোবাসি অরণ্য, বড়োবড়ো গাছ, বনস্পতি। আমার যে কী ভালো লাগে বলতে পারিনে। তার ছায়া প্রাণ মাতিয়ে তোলে। অনেকে আবার তা সহ্য করতে পারেন না। যখনি দেখেন গাছ বড়ো হোলো—কি, কাটো তাকে। ঐ একটু একটু গাছে একটু একটু রং, ঐ নিয়েই তারা খুশী। আমি কতবার চেষ্টা করেছি বড়ো গাছ তৈরি করে আমি তার তলায় সকালে, দুপুরে, সন্ধেয় ঘুরে বেড়াব। রবীন্দ্রনাথ বিহ্বলচিত্তে তার তলায় কল্পিত্ব করবেন; কিন্তু এ জন্মে তা আর হোলো না। আসছে-বারে আমি ঠিক Forest officer হয়ে জন্মাব। আশ্চর্য, বড়ো গাছের মাথায় যখন মেঘ করে আসে, তার সৌন্দর্য কিসে লাগে। তার সৌন্দর্যের কি তুলনা হয়, যখন সেই মেঘের ছায়া এসে পড়ে ঐ একটু একটু গাছের উপরে, তার সঙ্গে।

৪ঠা মার্চ, ১৯৩৯

নাচটা আমার এ জন্মে আর হোলো না। মা যদি

আমার ছেলেবয়সে এই তোমার ছেলের মতন আমায় একটু-আধটু নাচাতেন, তাহলে বয়েস কালে নাচ কাকে বলে তোমাদের দেখিয়ে দিতুম। এখন পা দুটোই যে অচল; তারা অনেক আগে থেকেই ধর্মঘট করে বসে আছে। বলে, আমাদের দিকে তো কোনোদিন চাইলে না, হাত নিয়েই তুমি খেলা করেছ। তাই দেখো না, আজকাল নিজের পায়ে দিতে কত তেল খরচ করছি, তবে না তারা একটু মুখ তুলে চাইছে মাঝে মাঝে।

৬ই মার্চ, ১৯৩৯ ; মৃন্ময়ী-প্রাঙ্গণ, সকাল

প্রজাপতিটিকে ভগবান নিজেই সাজিয়ে দিয়েছেন। তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই। মানুষ সেই সাজ নিল নিজের রুচি অনুযায়ী। ছড়াল রঙের বাহার তার পাগড়িতে, জামাতে। মহাত্মাজি আসবার আগে পর্যন্ত মানুষ সেদিকে সতর্ক ও যত্নবান ছিল। আজকাল রব উঠেছে সব মানুষকে সমান হোতে হবে তাদের সাজপোষাক একই রকম ক'রে। সব মানুষ যদি এক রকম পোষাক পরলেই এক পর্যায়ে পড়ে যায়, আর তাকেই যদি সভ্যতার চূড়ান্ত ব'লে ধরা যায়, তবে তো দেখছি, জার্মানি পৃথিবীর সবচেয়ে উপরে স্থান পায়। কেননা, সেখানে শুধু পোষাকে নয়, মনকেও তারা জোর করে এক সুরে বাঁধতে চায়, একই কথা বলাতে চায়। তাহলে এত শিক্ষাদীক্ষার কী দরকার ছিল। মনের গতি যদি স্বাধীনতা না পায় তবে শিক্ষার এত আয়োজনের

লাভ কী। এর চেয়ে আমাদের দেশই ভালো কারণ সেখানে শিক্ষার বালাই নেই। তাদের যা করতে বলবে তাই করবে, একবার প্রতিবাদ পর্যন্ত করবে না, কারণ প্রতিবাদ করবার বুদ্ধি পর্যন্ত তাদের খোলেনি। রাশিয়াতে আমি এই কথাই বলেছি বারে বারে যে, এ একদিন ফেটে পড়বেই। এ-ছাঁচ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। একটা বড়ো গাছকে টবে রেখে দিলেই যদি নিশ্চিন্ত হই মনে করি, তার মতো বোকামি আর নেই। সে টব ফেটে একদিন চৌচির হয়ে শিকড় বেরিয়ে পড়বে, তার নিজের জায়গা খুঁজে নেবে। ওরা কিন্তু সবাই শুনেছিল, বেশ মন দিয়েই শুনেছিল তা, কিছু বলেনি আমায়। এমন কি, মার-ধোরও করেনি।

ব'লে হাসিমুখে লিখবার খাতা খুললেন। আমরাও ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে এলুম।

দুপুর

ওরা জানে না যে, সত্যি কথা বললে আমি কিছুই বলি না বা রাগ করি না। দোষ ক'রে তা স্বীকার করাকে আমি সকলের আগে ক্ষমা করি।

... ...

—এক-একটা মানুষের মনের গণ্ডি কতটুকু সীমাবদ্ধ ভাবলে অবাক হই। এই তো দেখ্ না, এই চীনজাপানের যুদ্ধ, কত মানুষ আছে তাদের মনে একটু রেখাপাতও করে না; তাদের সেই সীমার ভিতরে পৌঁছতেই পারে না এই ব্যাপারের চিন্তা।—

৮ই মার্চ, ১৯৩৯

কাল দুপুর থেকে গুরুদেবের শরীরটা হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাজেই বিকেলে ও রাত্রে তিনি একটু লেবুর সরবৎ ছাড়া আর কিছু খাননি। আজ সকালে উঠেই গুরুদেবের খোঁজ নিতে গেলুম। এরি মধ্যে উঠে তিনি কৌচে বসেছেন। কাল খবর পাওয়া গেছে মহাত্মাজি উপোস ভেঙেছেন। গুরুদেবকে প্রণাম করে কুশল প্রশ্ন করতে তিনি বললেন :

মাহাত্মাজির তো উপোস শেষ হোলো, আর আমার হোলো শুরু দেখছি। মাথাটাই টলমল করছে, নয়তো এমনিতে ভালোই আছি। শারীরিক কষ্ট আমি পাইনে মোটেই। একবার আমায় বিছে কামড়েছিল, সে কী যন্ত্রণা। হঠাৎ আমার মনে হোলো, এ তো আমি কষ্ট পাচ্ছিনে, রবীন্দ্রনাথ ব'লে একজন কবি আছে তাকে বিছে কামড়েছে। এই ব'লে আমিই আমাকে আলাদা করে দেখতে আরম্ভ করলুম। আর দেখতে লাগলুম যে, রবীন্দ্রনাথ ব'লে একটা লোক কষ্ট পাচ্ছে। চট করে আমার যন্ত্রণা-টন্ত্রনা কোথায় যে গেল—সব ভুলে গেলুম। মনে এমন একটা আনন্দ হোলো যে, এমনি একটা উপায় থাকতে লোকে কেন কষ্ট পায়। কষ্ট দূর করবার এ উপায়টি আমার জানা ছিল না। সেই অবধি আমার কোনো শারীরিক কষ্ট হোলে আমি ওমনি যে কষ্ট পাচ্ছে সেই রবীন্দ্রনাথকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে দিয়ে দেখি। কাছে আসতে দিই না।—

একটু পরে চোখের ওষুধ হাতে নিয়ে ওঁর কাছে এলুম চোখে ওষুধ দেব বলে। তিনি দেখে বললেন :

কী গো চক্ষুদাত্রী, তুমি এসেছ একেবারে তৈরি হয়ে? দেখো, ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাকবে। যখন কেউ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী লিখবে তখন তাকে বোলো যে, রবীন্দ্রনাথের চোখের জল একজনই শুধু ফেলতে পেরেছে, সে হচ্ছ তুমিই। বাপ রে, কী জলটাই ঝরাচ্ছ তুমি দিনে তিনচার বার করে।—

৯ই মার্চ, ১৯৩৯

এ বছর অনাবৃষ্টিতে ও প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে চারদিকের গাছপালা সব যেন ঝলসে গেছে।

গাছগুলির অবস্থা দেখেছ এরি মধ্যে? এবার আর বেলফুল ফুটবে না। কিসের আমরা বসন্তের উৎসব করছি। ভগবানের উপর রাগ হয়। একটু সৌন্দর্যের কাঙ্গালী আমরা, তাতেও তাঁর এত কার্পণ্য।

বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এলেন—হু হু করে গরম হাওয়া বইছে। চারিদিক থেকে যেন গরম একটা তাপ উঠছে। গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাব; কিসে যেন তন্ময় হয়ে গেছেন। ধীরে ধীরে বললেন:

ভালো, বড় ভালো, বড়ো সুন্দর এই পৃথিবীটা। দু-চোখ মেলে যা দেখেছি তাই ভালোবেসেছি।

বলতে বলতে ডানহাতখানি সামনে মেলে ধরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গেয়ে উঠলেন:

"এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।" গেয়েছি, বড়ো খাঁটি কথাই গেয়েছি।

... ...

বিকেলে কয়েকটি মেয়ে এসে গুরুদেবকে গান শুনিয়ে গেল। তারা চলে যেতে গুরুদেব গান সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বললেন :

মেয়েদের দেখেছি আমি গানে যে দরদ সেটা বয়সের emotionএর সঙ্গে আসে। ওটা আগে পিছে জোর করে হয় না।

১০ই মার্চ, ১৯৩৯

মৃন্ময়ী-প্রাঙ্গণে সকালে গুরুদেবের প্রাতরাশের টেবিলের পাশে অন্যান্য দিনের মতো আজও আমরা বসে নানা গল্পগুজব করছি। আজ "গান্ধীপুণ্যাহ"—বেশির ভাগ কথা হচ্ছিল গান্ধীজিকে নিয়েই।

আমার সত্যিই আশ্চর্য লাগে, নিজে ভাবতে পারিনে, এই ধর্ না মহাত্মাজির কথা, উপোস করলেন, উপোস ভাঙলেন, শরীর একটু সারলেই দিল্লি যাবেন, ঝগড়া করতে হবে। তারপরে এখানে যাবেন, ওখানে যাবেন, চলেইছে। বাপ রে, এর চাইতে দেখি আমার এই গান লেখা বেশি সহজ।

২৪শে মার্চ, ১৯৩৯

ডাক আসার সময় হোলে প্রায় রোজই গুরুদেবের কাছে যাই, পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াই। তাড়া-তাড়া মাসিক কাগজ, দৈনিক কাগজ, বিলিতী কাগজ, চিঠি, শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ, বাইওকেমিকের বিজ্ঞাপন, সার্টিফিকেটের জন্য অনুরোধ, বইয়ের পার্শ্বেল, পেন্সিলে আঁকা, সেলাই করা, মাটিতে গড়া নানা রকমের রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ইত্যাদিতে টেবিল স্তূপীকৃত হয়ে যায়। বড়ো মজা লাগে দেখতে, কী করে উনি একটার পর একটা সব কিছু পড়ে যান, দেখে যান। মাসিক কাগজগুলি বাঁ হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে শেষদিক থেকে পাতার পর পাতা উলটিয়ে যেতে যেতে, ঐ নিমেষটুকুর মধ্যেই যে-পাতায় যা লেখা

তার সারাংশটা গড়গড় করে বলে যান। মিনিট দেড়েকের মধ্যে গোটা বইটা তাঁর পড়া হয়ে যায়। কোথায় কী আছে, কী বলেছে কিছুই জানতে তাঁর বাকি থাকে না। এমন কি, সে সব সম্বন্ধে নিজের মতামতও বলে যান সেই সঙ্গে। শেষে বই সমেত ডানহাতখানি পিঠের দিকে বাড়িয়ে দেন। জানেন তিনি, এই মাসিক পত্রিকাগুলির প্রতিই আমার বিশেষ লোভ। পরপর কাগজগুলি এইভাবে হস্তগত করি। মাঝে মাঝে চিঠির খাম ছিঁড়তেও সাহায্য করি। অসংখ্য চিঠি, খুলে একবার তিনি শুরুটা দেখেই শেষের দিকটা দেখেন—চিঠির মর্মার্থ টা তাঁর জানা হয়ে যায়, দরকারীগুলি পাশে রাখেন, অদরকারী-গুলি ঝুড়িতে ফেলেন, পাগলের প্রলাপগুলি সেক্রেটারিকে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে দান করেন। অবাক লাগে এত চিঠি রোজই কী করে পান। জিজ্ঞেস করলুম যে, কোনোদিন কি এমন হয়েছে যে, চিঠি আপনার একেবারেই আসেনি বা মাত্র দু-একখানা! গুরুদেব একটু হেসে বললেন:

> তা, এমন দিন যায় না যে, চিঠি আমার একেবারেই আসে না। তবে এক-একদিন গেছে একখানি মাত্র চিঠি এসেছে। সত্যি বলতে কী, একটু লাগে তাতে। বোঝা যতই হোক, মনের কোণে একটু প্রসাদ লাভ করি বই কি। অনেকে বলে এই বোঝা হচ্ছে, penalty of greatness, কিন্তু penaltyটা মাঝে মাঝে greater than the greatness হয়ে পড়ে বই কি, তখনি ঠেলা এর সামলাতে পারিনে।

২৫শে মার্চ, ১৯৩৯

> পুরুষের চেয়ে মেয়েরা বাঁচে বেশি। কারণ তাদের অনেক vitality জমা থাকে। পুরুষেরা কত সহজে

অল্প অসুখেই মারা যায়, কিন্তু মেয়েরা অনেক কঠিন কঠিন অসুখও সহজে পেরিয়ে আসে। তোমাদের কত সুবিধে, ওটাও তো একটা প্রার্থনীয় বস্তু। অবশ্যি আমার পক্ষে নয়। একটা বয়সের পরে আর ওটার দাবি না করাই উচিত, কিন্তু দেখবি, সময় যত কাছে ঘনিয়ে আসবে ততই একটা বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হবে। যুক্তি দিয়ে ওখানে কিছু করা যায় না, মানব-মনের ধর্মই এই।

২৬শে মার্চ, ১৯৩৯

"শ্যামলী" "পুনশ্চ" দু-বাড়িতেই গুরুদেবের জিনিসপত্রাদি রাখা হয়েছে। তাঁর খুশিমতো কখনো তিনি এ বাড়িতে থাকেন, কখনো বা ও বাড়িতে।

এখন আমার দু-দুটো বাড়ি। এত ঐশ্বর্য আমার, এ আমার হোলো কী। থাকতুম একখানা দুখানা ঘরে, আর এখন আমার বাড়ির পরে বাড়ি—ভাবতেও যে অবাক লাগে।

৬ই এপ্রিল, ১৯৩৯ ; শ্যামলী, সকাল

যখনি ভাবি এবারে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসব, ছবিটবি আঁকব, ঠিক সেই সময়ে আমাকে শনিগ্রহ চেপে ধরে। কিছুতেই বসতে দেবে না এক জায়গায়। কেবল ঘুরিয়ে মারে আর খাটিয়ে নেয়। সকাল হোলেই মনে পড়ে আজ কী কী লিখতে হবে, কী কী করতে হবে। অমনি যেন দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে।

... ...

কত কঠিন কঠিন কাজ আমাকে করতে হয়। যাকে

শ্রদ্ধা করিনে, তার সম্বন্ধে স্তুতিবাক্য লিখতে হবে—এ যে কত বড়ো কষ্টদায়ক—তোরা বুঝবিনে।

৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯ ; শ্যামলী, সকাল

দিনটি কেমন মেঘলা করেছে। আমাদের কবিদের পক্ষে এই দিনটি চমৎকার, চারদিক কেমন সরস হয়ে আছে। মনটিও কেমন গুনগুন ক'রে ভিতরে বাইরে মেতে ওঠে। শুকনো খটখটে দিনটা আমাদের পক্ষে তত সুবিধের নয়। অবশ্যি আমি তা ঠিক বলতে পারিনে। দুপুর রৌদ্রেও আমি দরজা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকি, রৌদ্রের ঝলমলানি দেখি। আজ কাল চোখে লাগে। ভগবান কেন যে আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিচ্ছেন জানিনে। এই চোখ দিয়ে তাঁর সৃষ্টি দেখে আমি যে কী সুখ পাই—সেটাতে কেন যে আমি বঞ্চিত হচ্ছি বুঝিনে।

শ্যামলী, দুপুর

পারিস তোরা আমাকে আবার ফিরিয়ে দিতে আমার সেই ছেলেবেলাকার দিনগুলি—যেখানে কোনো দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই? মহা আনন্দে দিনগুলো কাটিয়ে দিতুম তবে।

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯

বড়ো কষ্ট হয় এই "দিনের" ভারটা বইতে। এক-একটা করে দিন যাচ্ছে, নতুন দিন আসছে—নতুন নতুন কাজ নিয়ে। দেহটাও বিকল হয়ে যাচ্ছে, সব

যন্ত্রপাতিগুলো আর ঠিকমতো কাজ করে না। অথচ এই দেহেরই উপর একদিন কী না অত্যাচার করেছি। ছেলেবেলায় স্কুল পালাবার জন্যে কার্তিক মাসের হিমে সারারাত বাইরে পড়ে থাকতুম, কাপড় চোপড় ভিজে জবজবে হয়ে যেত। দিনে দশবার করে জুতোসুদ্ধ পা ভিজিয়ে রাখতুম, যদি কোনো রকমে সর্দিকাশি হয়, স্কুল পালাতে পারব। তারপর বড়ো হয়েও এই দেহটার উপর কম অত্যাচার করেছি? কিছু যত্ন নিইনি, কোনোদিন শরীর সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই ছিল না। এটা দিয়ে কী হবে এমনি একটা ভাব ছিল। আমাকে একবার টার্কিশবাথে এক জার্মান বলেছিল, "Young man, তোমার শরীরের কী চমৎকার ফ্রেম।" কাঠামোটা ভালো ছিল বলেই হয়তো এত অত্যাচার সয়েও শরীরটা এখনো টিঁকে আছে। কিন্তু এখন আর যেন কিছু ভালো লাগে না, বুঝে উঠতে পারিনে কী করব। তবে এটা বুঝি, একটা কী আলাদা জগৎ আমার এখন দরকার। এই যেটা সামনে আছে এটা ঠিক নয় আমার জন্যে। পেতুম Arabian Night এর সেই কার্পেটটা, উড়ে চলে যেতুম নতুন রাজ্যে। পড়েছিস বইটা? অমন গল্প আর হয় না। আর ছিল, ছেলেবেলায় পড়েছি; "রবিন্সন ক্রুসো",—এর আর তুলনা নেই। আশ্চর্য বই। ছেলেবেলায় পড়তে পড়তে ভোর হয়ে থাকতুম। চোখের উপর পাহাড়, নদী, দ্বীপ সব ভাসত। ছেলেদের জন্যে adventure-এর বই এমনিতরো আর নেই।

দুপুর, শ্যামলী

সেবাটা মেয়েদের হাতেরই জন্য—ও হাতের জন্যেই সেবা। ও-হাত ছাড়া সেবা পেয়ে সুখ নেই। অমন দরদভরা সেবা পুরুষের হাতে হয় না। মেয়েদের ওটা নিজস্ব জিনিস।

... ...

বিয়ে একটা মস্ত বিপদ। এই বিপদ আবার সবাই ঘটিয়ে বসে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে। সংসার, বিয়ে, ছেলেমেয়ে, ঝগড়াঝাঁটি, কান্নাকাটি, দুঃখকষ্ট,—কী হাঙ্গামা। তবু যখন সাহানায় সানাই বাজে, মন কেমন করে।

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৯

সন্ধে হয়ে গেছে অনেক আগে। গুরুদেব শ্যামলীর সামনে খোলা আঙিনায় কৌচে বসে আছেন, মোড়ার উপর পা দুখানি সামনে প্রসারিত। ঘরের বাতি সব নেভানো। পিঠের কাছে শ্যামলীর সংলগ্ন গোলঞ্চ গাছটি থেকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে, গুরুদেবের চারপাশে। পরনে তাঁর একটি খয়েরি রঙের লুঙি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে এ যেন একখানি ছবি দেখছি। গুরুদেব আজকাল রোজই দিন অবসানে বড়ো ক্লান্ত বোধ করেন। পাশে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। তিনি অনেকক্ষণ চুপচাপ চোখ বুজে থাকার পর ধীরে ধীরে বলে উঠলেন :

বলতে পারিস কবে ছুটি পাব, কবে বিধাতা আমায় ছুটি দেবেন? ছুটির জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। আর কাজকর্ম ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে কেবল বসে বসে

চারদিক দেখি, গুনগুন করে গান করি। এই জায়গাটিতে বসে কত তারা দেখতে পাই, বড়ো ভালো লাগে। কী আশ্চর্য ঐ তারাগুলো। এই যে আলোটুকু দেখছিস—এ কত কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছে। আজও আমরা তার আলো পাচ্ছি। আর কী ভীষণ ক্ষমতা ঐটুকু তারার মধ্যে। ভিতরে তাদের কী দাহন চলেছে, অথচ মানুষের কাছে তা'রা কী স্নিগ্ধ, সুন্দর, কত ছোটো। মানুষের কাছে ওরা ছোটো হয়ে দেখা দিয়েছে। কী শান্তিপূর্ণ এই তারাগুলো।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৯, সকাল, শ্যামলী প্রাঙ্গণ

নববর্ষ—ধরতে গেলে রোজই তো লোকের নববর্ষ। কেননা, এই হচ্ছে মানুষের পর্বের একটা সীমারেখা। রোজই তো লোকের পর্ব নতুন করে শুরু হয়।

... ...

ছবি আঁকা হচ্ছে বৈরাগ্যের জিনিস। কোনো তাড়া নেই, কোনো তাগিদ নেই; সময় কেটে গেলেই হোলো। সময় কাটানো দিয়েই দরকার।

১১ই জুলাই, ১৯৩৯

আমি আজকাল যা ছবি আঁকছি এ আমার নিজের মনের মতো নয়। এ রকম ছবি অনেকেই আঁকতে পারে। আমার হচ্ছে—যা ইচ্ছে তাই। কাগজ রং নিয়ে যা মনে হোলো তাই আঁকলুম, মনের সঙ্গে রং তুলি নিয়ে

খেলা করলুম। সেই হচ্ছে আমার ছবি। লোকেরা আবার পছন্দ করে আমার এখনকার ছবিই। তারা বলে যে, তারা এগুলোই বুঝতে পারে, আগের আঁকা ছবিগুলো বুঝতে পারে না। কিন্তু একটা কথা কী জানিস, সাধারণ লোক যা বুঝতে পারে না, তার মধ্যেই একটা এমন কিছু quality থাকে, যা তাদের বোধগম্য হোতে পারে না। আসলে সেটাই ভালো জিনিস। সাধারণ লোকেরা একটা কিছুকে যেই ভালো বলে, আমার মনে অমনি ভয় ঢুকে যায় যে, এটা ঠিক হোলো না। ওরা যখন নিন্দে করে তখনি মনে আনন্দ পাই নিজের কাজ সম্বন্ধে। কিন্তু মন এমনি জিনিস লোভ সামলাতে পারে না প্রশংসার। তাই যা সবাই প্রশংসা করে সেই মতো ছবি আঁকি অনেক সময়। এবারে দেখি, বসব আরেকবার, নিজের খেয়ালমতো ছবি আঁকব। অবসর পাই না রে। কাজ আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, তাকে ছাড়াতে পারিনে। একটা ছাড়াই তো, আরেকটা আসে। অবসর নেই, অবসর নিতেও পারিনে। আবার কাজ না করে থাকতেও পারিনে। এই তো অনেককে দেখি, কী ক'রে তারা কিছু না ক'রে দিন কাটায়, তাই ভাবি। 'কিছু না করাটা' খুব ভালো করেই করে তারা। আর আমার কাজ না থাকলেও কাজ করা বদ্ অভ্যাস। আমার সেক্রেটারি তো জোরগলায় বলেন, তার ঘরে হাঁড়ি চড়বার ভাবনা না থাকলে, কুঁড়েমি কাকে বলে, তা দেখিয়ে দিতেন। তা তো বটেই, ঘরে হাঁড়ি না চড়লে

যে মুখ হাঁড়ি হয় গিন্নিটির—সে ভাবনা তারও আছে, তাহলে।

... ...

রথীকে বলেছি, এবার আমায় ছোট্ট একটি বাড়ি করে দাও। দোতালা, উপরে মাত্র একখানি ঘর থাকবে, চারদিক খোলা। আর আমি কিছুই চাইনে। অনেক তো হোলো, অনেক বাড়ি ঘুরলুম, এবারে এই-ই হবে আমার শেষ কীর্তি। উপরে আকাশের সংলগ্ন থাকব, আকাশ দেখব, আবার যখন ইচ্ছে হবে, শাসি বন্ধ করে দেব। আর দেখব গাছের ডগায় সবুজ পাতার ঝিলিমিলি—আলোড়ন—

দুপুর

এবারে বেশ একটা রং রূপ পেয়েছে তোর ছবি। নিজের একটা স্টাইল দাঁড়িয়েছে, এই তো চাই। পরের ছুটিতে একটা নদীর ধারে যা', একটা ধারা, একটা গতি আছে যেখানে। মাঝে মাঝে ভাবি—দেখ্, তোর যদি এটা না করবার থাকত, তাহলে তুই কী করতিস। সবারই একটা কিছু 'করবার' থাকা দরকার।

... ...

—আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে "বেশ সুন্দর হয়েছে" তখনি আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার

উদ্ধার করি। এমনি ক'রে তার এক-একটা রূপ বের হয়। আমি মানুষের জীবনটাও এমনি করেই দেখি। মানুষ যখন একবার ঘা খায় বা পড়ে যায়—একটা কিছু সাংঘাতিক ঘটে, তারপরে মানুষ যখন নিজেকে ফিরে তৈরি করে, তখনি তার একটা সত্যিকার রূপ হয়।

... ...

চোখে দেখতে না পাওয়ার মতো দুঃখ আর নেই। দোষই বা দেব কাকে। সামনের বছর আমার আশি বছর বয়স হবে। চোখেও যদি দেখব, কানেও যদি শুনব তবে বুড়ো হবার, বয়স বাড়বার মানে থাকে না। তবুও দুঃখ হয় যখন প্রকৃতিকে দেখবার সুখ থেকে বঞ্চিত হই। এই দেখতে পাওয়া, এর যে কতখানি মূল্য তা আমি জানি, কিন্তু উপায় কী।

... ...

—গুরুদেব যখন যে রঙের জামাকাপড় পরেন, তাতেই যেন তাঁকে অতি সুন্দর মানায়। আজ সাদা লুঙি পাঞ্জাবি পরেছেন—এই শুভ্র সাজে যেন ঘর আলো করে বসেছেন।

গেরুয়া রং সন্ন্যাসীর সাজ, তা আমায় মানাবে কেন। আমি তো সন্ন্যাসী নই। সাদা রং হচ্ছে শুদ্ধ, পবিত্র। তাই সাদাই আজকাল ভালো লাগে বেশি।—

... ...

বিকেলে গুরুদেবের খাবার সময় ফলের গল্প করতে করতে এক সময় জিজ্ঞেস করলুম, এত রকম ফল থাকতে, কাঁঠালকে ফলের রাজা বলা হয় কেন। গুরুদেব বললেন :

তার কারণ কাঁঠাল বৃহৎ। অত বড়ো ফলকে রাজা

বলবে না তো, বলবে কাকে। রাজারাও তো তাই, তাঁরা বৃহৎ।

এই ব'লে গম্ভীর মুখে দু-হাত দু-দিকে প্রসারিত করে তাদের পরিমাণের নমুনা দেখাতে গিয়ে হেসে ফেললেন।

১৩ই জুলাই, ১৯৩৯

চোখ যে মানুষের কী জিনিস, তা সে-ই জানে যার দৃষ্টির অভাব পড়েছে। আমি যদি আমার চোখে ছেলেবেলাকার দৃষ্টি আবার ফিরে পেতুম। ভগবানকে না হয় বাতাসা, নবাত মানত করতে রাজি আছি; কিন্তু *পাঁঠা* মানত করতে রাজী নই। আচ্ছা দেখ্ কী নিষ্ঠুরতা —"আমার অমুক করো মা, তোমায় *পাঁঠা* দেব।" মানুষের এই মনোভাব, কী করে যে আসে।—নিজের স্বার্থের জন্যে একটা প্রাণ বিনষ্ট করা। আমি একবার কালীঘাটের ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম; দেখি, একটা লম্বা মতো বামুন, গলায় পৈতা, যেখানে একটা বেড়া দেওয়া সীমানার মধ্যে পাঁঠাগুলি থাকে, সেখান থেকে একটা পাঁঠার একটা পা ধরে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল। বলি দিতে দিতে সে এমনি কঠিন হয়ে গেছে যে, একটা প্রাণীকে একটা যে-কোনো জিনিসের সামিল করে ফেলল। এই বর্বরতা আমাদের এখনো ঘুচল না।

... ...

দুপুরে গুরুদেব কৌচে বসে বই পড়তে পড়তে বইখানি কোলের উপরে উলটে রেখে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি কাছে বসে এই সুযোগে তাঁর একটি portrait আঁকছিলুম। খানিকবাদে চোখ খুলে বললেন:

ঘুমটা যখন আসে তখন যেতে চায় না সহজে, তাই আমি তাকে আসতে দিতে চাইনে। আচ্ছা রে—আমার মুখের রেখায় কিছু টের পাচ্ছিলি? আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখছিলুম—আশ্চর্য, কোনো স্বপ্ন আমার মনে থাকে না।

... .

ফরমাশ এসেছে, ছোটো গল্প চাই। কয়দিন থেকেই গুরুদেব এ নিয়ে ভাবছেন :

এমন কেন হয়। আমার brain কেন আগের মতো কাজ করছে না। আগে একটু কিছু ভাবলে একটা কিছু তাকিয়ে দেখলেই—একটা কিছু তার রূপ দিতে পারতুম। আজকাল ভেবে ভেবেও একটা প্লট খুঁজে পাইনে।—

... ...

গুরুদেব রঙিন পেনসিল দিয়ে ছাবি আঁকছেন, আমি সেগুলো ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তাঁর হাতের কাছে রাখছি :

পেনসিলগুলো আমার পটপট করে ভেঙে যায়। অবশ্যি আমি একটু চাপ দিয়েই আঁকি।—মনটা জোরে চলতে থাকে কিনা।

... ...

ডান হাতটা সারাজীবন আমার লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আর বাঁ হাতটা সেই অনুপাতে কিছু না করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আছে। দু-হাতে লিখতে পারলে, বেশ হোত—না রে?

২৪ জুলাই, ১৯৩৯

জানিস, আমি আর্টিস্ট নই। আমি যা আঁকি, তা মনের অগোচরে। ইচ্ছে ক'রে আঁকা বা আঁকতে চাওয়া, তার একটা রূপ দেওয়া—তা আমার দ্বারা হয় না। হিজিবিজি কাটতে কাটতে, একটা কিছু রূপ নিয়ে যায়. আমার আঁকা। এ'কে কি আর্টিস্ট বলে। তোমরা আমায় স্তুতিবাক্যে ভোলাও। দেখো না কতগুলো মাথামুণ্ডুই আঁকলুম। কোনোটার গোঁফ আছে, কোনোটার নেই, কোনোটা বেঁকে আছে, কোনোটা অদ্ভুত—এর কি কোনো মানে আছে।

... ...

এবারে আমার একটি আস্তানা করব। দোতালায় একটি ঘর শুধু, চারিদিক থাকবে খোলা। সেখানে বসে বসে কেবল ছবি আঁকব আর কিছু করব না; কোনো কাজের ভাবনা থাকবে না। ছবি আঁকতে আমি আনন্দ পাই; সেটা আমার খেলার মতন। বেশ লাগে, সময় কেটে যায়, মন খুশী হয়। তাই কি যথেষ্ট নয়। তা না—কেবল আমাকে কাজের তাড়া, আর কেন বাপু। আমি বলি, আর আমার কাজের দরকার কী। আমার আর কিছু করবারই দরকার নেই। অনেক তো করেছি, মন বলে কেন আর কর্মের ভার বাড়াচ্ছ। দেখো না কেন—গান, গানই হোলো হাজার তিনেক। ছবি হোলো হাজার দুয়েক। বই, মুঠো মুঠো বই লিখেছি। অত বেশি আবার ভালো নয়। এবারে থামা উচিত। তারপরে,

এই ধরো না, তোমার ছেলেই আমায় গালাগালি দেবে; বলবে যে-কালে রবীন্দ্রনাথ এই সব লিখেছেন, সেটা ছিল "প্রিমিটিভ যুগ"। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, এতে কোথায়। কত গালিগালাজই তখন আবার এদের কাছে খেতে হবে। এখন যে ওকে 'লজেন্স' দিয়ে ভোলাচ্ছি, তখন কি আর তার মনে থাকবে?

... ...

দিনটা আজ বেশ করেছে, একটু আলো, একটু রোদ, শরৎকালের স্নিগ্ধতা এসেছে যেন এতে। শরৎকাল যেমন স্নিগ্ধ, তেমন তীব্রও। আজকের এটাকে বসন্তের আভাসও বলতে পারিস। সেইরকমই হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে। আচ্ছা, তুই তো ছবি অনেক এঁকেছিস—এবারে একটু লেখার চেষ্টা কর্ তো। কিছু না, কোমর বেঁধে লেগে যা। যা মনে হয় লিখে যাবি। এমনি করেই লেখার অভ্যেস হয়ে যাবে। আমি যখন লেখা আরম্ভ করি, অমনি করেই করেছিলুম। যা মনে আসত লিখেছি। সারাজীবনে কত। এখন আর তেমনটি পারিনে। ইচ্ছা করলেও আজকাল একটা ভালো লেখা লিখতে পারিনে। এমন হয়েছে যে, অর্জুন আর তার গাণ্ডীব তুলতে পারছে না। এ কি কম দুঃখের কথা রে।

... ...

এ জীবনে কত যে লিখেছি, কত কাজ করেছি, আর কেন। ভাবি কিসের জন্যই বা করেছি। লিখেছি, ছবি এঁকেছি, গান গেয়েছি—আনন্দ পেয়েছি। তাতেই

সন্তুষ্ট থাকলে হোত। কিন্তু তা নয়—মানুষ চায় মানুষের কাছ থেকে recognition. চায় সবাই বলুক, "বাঃ বেশ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে।" এই যে নামের একটা মোহ—এ কিছুতেই এড়ানো যায় না।

... ...

ছেলেবেলাকার কথা কত মনে পড়ে আজকাল্। মজা দেখ্, আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলুম—পুরোপুরি ছেলেমানুষই ছিলুম। চুপ করে বসে দেখতুম, ভাবতুম। আর এই ধর্ না—তোদের ছেলেরা, জ'ন্মেই তারা মোটর গাড়ি চড়তে চায়। তারা যেন কয়েকটা বছর এগিয়ে এসে জন্মায়। এদের জীবনে ক'টা বছর বাদ দিয়েই এদের শুরু—আর আমরা বরং আরো নেগেটিভ ঘেঁষে এক এরও বাদ ওদিকে গিয়ে জীবন শুরু করেছিলুম।

২৭শে জুলাই, ১৯৩৯; পুনশ্চ, সকাল

কী বিশ্রী দিন করেছে—কোথায় যাই বল্ দেখি। কী যে দেশে জন্ম নিয়েছিলুম—কয়টা মাসও নিশ্চিন্ত মনে কাটানো যায় না। আর কেবল কাজের চাপ, কোথাও গিয়ে পালাতে পারলে বাঁচতুম। আগের দিনে বুদ্ধদেব ওঁদের খুব সুবিধে ছিল। ইচ্ছে হোলো—চলে গেলেন রাজগিরি, নয়তো নালন্দা, নয়তো সারানাথ। আমার মতো সুশিক্ষিত লেখাপড়া জানা সেক্রেটারি দরকার হোত না। আপনিই তাঁর দল জুটে যেত। "সেক্রেটারি" ব'লে কোনো বালাই ছিল না তাঁদের। তখনকার দিনে তো আর রেলগাড়ি ছিল না; হেঁটেই তাঁরা সব

জায়গায় যেতেন। আর আমাকে দেখ্, কেমন পরাধীন হয়ে গেছি। অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এই যে একটা ভিতরের শক্তির দুর্বলতা, এ বড়ো খারাপ—এ ঠিক নয়।

২৮ জুলাই, ১৯৩৯

সকালে উঠেই কেমন ঘুম পাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলুম না। উঠেও কেমন মনে হচ্ছে আর-একটু ঘুমুলে হোত। এ তো ভালো নয়। ঘুম সুস্থতার লক্ষণ, কিন্তু ঘুমের জড়তা থাকা বড়ো অসুস্থতার লক্ষণ। এ আমার কিন্তু কোনোদিন হোত না, বয়সের বোঝাকে কিছুতেই আর সামলে রাখতে পারছি না যে—

... ...

রথী বলেছেন গল্প লিখে দিতে হবে। আজকাল ও-ই তো আমার একমাত্র অভিভাবক। তাই ও যখন কিছু বলে এসে—এড়াতে পারিনে। নয়তো গল্প লেখা কি এখন আমার আসে। ও তো যৌবনের খোরাক। এ বয়সে আর ও কাজ করতে পারিনে। তবুও লিখছি একটা—লিখতেই যখন হবে।—

৩১শে জুলাই, ১৯৩৯

দেখ্ তো অন্ধের মতো বসে বসে এই ছবিখানি করলুম। শুধু লাইনেই রেখে দিলুম। এইতেই যখন ছবি একটা কথা বলছে তখন আর তাতে কিছু করা উচিত নয়। নয়তো আমার স্বভাবই হচ্ছে ছবিকে নষ্ট করে তারপরে

তাকে উদ্ধার করা। বেশ মজা পাই আমি তাতে। এই ছবিখানাতে বেশ একটু চিন্তার ভাব এসেছে—না? আমার সব ছবিই এই রকম। হাসিখুশী ভাব হয় না কেন, বলতে পারিস? অথচ আমি নিজে হাসতে ও হাসাতে ভালোবাসি, কিন্তু আমার সব ছবিরই ভাব কেমন যেন বিষাদমাখা। হয়তো ভিতরে আছে আমার ওটা—

... ...

কাল বিকেলে তোমার বাড়িতে দেখি চীনে প্রফেসর* তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমি ওদিক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলুম মোটর ক'রে। ওদের দেখে তোমার বাড়ি নেমে তোমার হয়ে গল্পগুজব করে এলুম। ওদের বললুম, তোমরা যদি গৃহস্বামিনীর জন্য অপেক্ষা করো তবে ভুল করবে। তিনি এখন কোথায় গেছেন কখন্ ফিরবেন তার কি কিছু স্থিরতা আছে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি আমার এই মোটরে করে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

১৭ই মার্চ, ১৯৪০

একদিকে'—', আর-এক দিকে'—'; দুজনে লড়াই বেঁধেছে। কী করি বল্। দু-দিনের জন্য সংসারে আসা, কতটুকুই বা জীবনের মেয়াদ। আর কে-ই বা কার—তার মধ্যে আমরা কেবল সংগ্রাম করেই মরছি—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।

* অধ্যাপক তান-উন-সান; শান্তিনিকেতন চীনভবনের অধ্যক্ষ।

[illegible]া এপ্রিল, ১৯৪০ ; দুপুর

কত রকম মৃত্যুই আছে সংসারে ; আমি এক-এক সময় বসে বসে ভাবি। এই একটা বিলিতী কাগজে খানিক আগে পড়ছিলুম অতি সহজ মৃত্যু হচ্ছে গরম জলের টবে বসে হাতের নাড়ীটা কেটে দাও—আস্তে আস্তে সব রক্ত বেরিয়ে গিয়ে শরীরটা ক্রমশ ঝিমিয়ে আসবে—ব্যস্। দেখ্ দেখিনি, কত সহজ মৃত্যু। অথচ মানুষ মৃত্যুকে কত বীভৎস করে তোলে। জলে-ডোবা মৃত্যুও সহজ, কেন যে লোকেরা ভয় পায় ভীষণ ভেবে। কথা হচ্ছে—সেই যে একটা অতল অন্ধকার সেইটাকেই ভীষণ ভেবে ভয় পায়। নয়তো দম আটকে আর কয় মিনিট ছটফট করতে হয়, সে কিছুই নয়। ওটুকু মৃত্যু-যন্ত্রণা যে রকম করেই মরো না কেন, সইতে হবেই।

আজকাল সন্ধে সাতটার সময়ই ঘুমুতে যাই। ঘুম কি আসে। যদিই বা আসে মাঝরাত্রেই ঘুম ভেঙে যায়। তখন কত কিছু যে ভাবি। আমি এক-এক সময়ে কল্পনা করি যে, আমায় সাপে কামড়াল। আচ্ছা বেশ, দেখতে দেখতে আমার সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে এল, তারপরে মৃত্যুটা পর্যন্ত অনুভব করতে পারি। অবশ্যি সব কল্পনাতেই। কিন্তু বেশ জানি, মৃত্যুটা কিছুই নয়।—

… … …

আমার শরীরটা এমন ভেঙে গেছে! আমি আছি যেন কুয়াশাচ্ছন্নের মতো। একটা কুয়াশা আমাকে সব দিক দিয়ে ঢেকে রেখেছে। চোখেও ভালো দেখিনে,

কানেও ভালো শুনিনে, হৃদযন্ত্রটাও বিগড়ে ওঠে মাঝে মাঝে। আছি আর কি আমি কোনোরকমে।

... ...

খুব তো ঘুম দিয়ে উঠলুম দুপুরে। আর কত কুঁড়েমি করব। এবারে কাজে লাগা যাক, কী বলিস। কাজ আর কাজ। দেখ্‌না, ঘাড়ে আমার কত কাজ জমে আছে। আর ভালো লাগে না। এখন কুঁড়েমি করে দিন কাটাতে পারলে বাঁচতুম। আর কোনো ঝঞ্ঝাট ভালো লাগে না। পুরুষরা জানিস, ওরা হাড়ে কুঁড়ে। পেটের জন্য ওদের খাটতে হয়। নয়তো পুরুষরা সত্যিই কুঁড়ের জাত। কাজ হচ্ছে তোদের অস্থিমজ্জায়। কাজ না করে তোরা পারিস না। রান্না করছিস, নয়তো সেলাই—ফোঁড়াই, ঝাড়পোঁছ, একটা না একটা করছিসই। কাজ না ক'রে মেয়েরা থাকতে পারে না।

ঘড়িতে দুটো বাজবার সঙ্গে সঙ্গে থেমে থেমে এলার্ম বাজতে লাগল।

দুটো বাজল—এবারে একটু কফি খেয়ে কাজে লাগি। দেখ্‌না, চাকরদের জাগাবার জন্য ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া আছে। একবার নয়, দুবার নয়, পাঁচবার বাজল এ। বন্ধ করিসনে, বাজতে দে। আমার বেশ মজা লাগে এর রকম দেখে। এ একবারে জার্ম্মাণীর হিটলার —কী জেদ গো। আমি এই ঘড়িটার সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখব ভাবছি—যেমন ধর্‌ঃ

ওগো এলারাম ঘড়ি
যারা কেলারাম বিছানায়
থাকে পড়ি,

তাহাদের জাগাবার লাগি
তুমি রহ জাগি।

এই সময়ে একটু কফি খাই, শুধু দুধ খাবার জন্য। একটুখানি কফিতে যতখানি পারি দুধ ঢেলে দিই। মহাত্মাজির কাছে কথা দিয়েছি ঘুমোব, আর বৌমার কাছে কথা দিয়েছি কফি খাব। কিন্তু মজা দেখ—কফি খেলে ঘুম আসে না আর ঘুমুতে গেলে কফি খাওয়া চলে না। দুটো ঠিক বিপরীত।—

. . . .

বৌমা কোথাও চলে গেলে আমার বড়ো খালি খালি লাগে। তোরা হচ্ছিস মায়ের জাত। শিশুরা যেমন মাকে আঁকড়ে থাকে তেমনি এ বয়সেও আমাদের বৌমাদের চাই, তাদেরই আঁকড়ে থাকি।

৫ই এপ্রিল, ১৯৪০

আজ সকালে প্রায় অন্ধকার থাকতে খবর পাওয়া গেল—দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ আর এ পৃথিবীতে নেই। খানিকবাদে আমরা গুরুদেবের কাছে গেলুম। তিনি উদয়নে জাপানি ঘরের পশ্চিমদিকের সরু বারান্দাটিতে বসে ছিলেন। চা খাওয়া হয়ে গেলে পর সেক্রেটারি তাঁকে এ খবর দিলেন। গুরুদেব কোলের উপর হাত দুখানি রেখে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। পরে অতি ধীরে ধীরে বললেন:

এণ্ড্রুজ মারা গেছেন। অনেক কালের বন্ধু ছিলেন। সুখে দুঃখে আমাদের এখানকার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যদিও তাঁর স্বদেশ আর এ দেশ

থেকেও তিনি গাল খেয়েছেন অনেক, কিন্তু আমরা সবাই ওঁকে মন খুলে ভালোবেসেছিলুম।

আমার চাইতে দশবছরের ছোটো ছিলেন। পেয়েছিলুম একটি, ও-রকমটি আর পাব না। রইল না। এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা এণ্ড্রুজের আমার জন্যে ছিল—কী না করতে পারত। আমার জন্যে এণ্ড্রুজ প্রাণ দিতে পারত। প্রাণ দিল সে কিন্তু অকারণে।

হাত দুখানি তেমনি ভাবে কোলের উপর একত্রিত করে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন আর এমনিতরো মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা বলছেন। খানিকবাদে লিখবার সব সরঞ্জাম চেয়ে একটি নতুন খাতায় লিখতে আরম্ভ করলেন। থেকে থেকে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ এসে এণ্ড্রুজ সাহেবের স্মরণার্থে আজ কী করা যায় সে-বিষয়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাচ্ছেন। খবর এসেছে চারটের সময়ে কলকাতায় এণ্ড্রুজ সাহেবের শবদেহ চার্চে নিয়ে যাওয়া হবে। ঠিক হোঁলো সে-সময়ে আশ্রমেরও সকলে একত্রিত হয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করবে। গুরুদেবের শরীর গত কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ; সারাক্ষণ ভিতরে কেমন একটা দুর্বলতা বোধ করেন।

তাঁকে নাড়াচাড়া করবার ইচ্ছে কেউ করেন না. কিন্তু গুরুদেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি প্রার্থনায় যোগ দেবেনই।

আমি উপস্থিত থাকব। আমি থাকব না ওঁর আত্মার জন্যে শান্তি প্রার্থনায়—এ হয় না। সবাইকে "পুনশ্চ"তে ডাকো, ওখানেই উনি এবারে ছিলেন—সেইখানেই সবাই সমবেত হয়ে প্রার্থনা করা যাক।

পরে নানা কারণে মন্দিরেই সকলে একত্রিত হয়েছিলেন। গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন।

এপ্রিল, ১৯৪০

আমার শরীরটা ভেঙে গেছে—এমন ভাঙা কখনো ভাঙেনি। এই ঘ্যানঘেনে শরীর বয়ে বেড়াবার মানে কী। বেশ একসঙ্গে শেষ হয়ে যায়—তা না—

বড়ো দুঃসহ লাগে আমাদের গুরুদেবের কথার সুরে এই রকমের বিষাদের আভাস পেলে। নিজেকে সামলাতে পারিনে, তিনি বুঝতেন তা। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে স্বচ্ছ গলায় বলতে লাগলেন :

জানিস,'—' লিখেছে যে, মঠওয়ালাদের সঙ্গে অনেক ঘুরে ঘুরে একটা জিনিস দেখে তার অদ্ভুত লাগল যে, তারা স্ত্রীলোকদের অবজ্ঞা করে। তারা বলে, 'ওরা যে মেয়েমানুষ।' কী অবজ্ঞার কথা গো। শুনেছিস, তোদের তারা একেবারে পোঁছে না, সম্মান দেয় না, তারা মেয়েদের দিকে তাকায় না। তার মানেই তাদের মনে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ভয়ের আশঙ্কা বেশি। সহজ হোতে পারেনি। জোর করে আঁটঘাট বাঁধলে কী হবে। আমাদের দেশে কোনো জিনিসেই একটা স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। সবটাতেই ঘ্যানঘ্যান, একটা অন্ধ মোহ প্রকাশ পায়। আমাদের শরীরে এত অনার্য রক্ত এখনো আছে যে, মাঝে মাঝে তা বেরিয়ে পড়ে।

... ...

বাগানে পোষা ময়ূরের ডাক শুনে বললেন :

ময়ূরের ডাককে কেন যে কেকাধ্বনি বলে—এ তো কেকা বলে না, ও বলে ক্যাঁও—ক্যাঁ-ও। অনেকটা বরং বেড়ালের মতো। ক্যাঁ-ও, কেবলই প্রশ্ন করছে ক্যাঁ-ও।

আমরাও তো তাই বলি। আকাশের দিকে তাকালেই মনে হয় কঁ্যা-ও, কেন, কিসের জন্য, কী ব্যাপার। উত্তর কে দেবে।

... ...

আকাশটা কেমন মেঘলা হয়ে আছে। দিনটা কেমন করুণ আজ, মনেও মেঘ ছেয়ে আছে। যাই এবারে স্নানে, উঠতে ইচ্ছে করছে না—

১০ই অক্টোবর, ১৯৪০ ; জোড়াসাঁকো, রাত ১২-৪৫ মিঃ

গুরুদেব রোগশয্যায়—জোড়াসাঁকোর বাড়ির "পাথরের ঘরে।" এখন একটু ভালোর দিকে, আশার আলো দেখা দিয়েছে সবার মনে। রাত্রে গুরুদেবের একটানা বেশিক্ষণ ঘুম হোত না। খানিকবাদে বাদেই ঘুম ভেঙে যেত। সেবার কাজে যারা থাকতুম তাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা ব'লে আবার ঘুমিয়ে পড়তেন।

এই বার তোমরা মাভৈঃ ব'লে থাকতে পারো। সেই লেখাটাও ভাবছি এবারে শেষ করতে পারব। কী, তুই মাথায় হাত দিয়ে ভাবছিস কী। আনন্দ কর্—

হাতের আঙুলগুলি তিনি থেকে-থেকে নাড়তেন, একবার করে হাত মুঠো করে আবার তা খুলে আঙুলগুলো টান করে মেলে ধরতেন।

তুই ভাবছিস, আমি কুস্তির প্যাঁচ লড়ছি—তা নয়। হাত দুটোকে একটু চালাচ্ছি। কেমন অরশ হয়ে গেছে—

রাত্রি ২-৩০ মিঃ

একবার তন্দ্রার ঘোরে বলে উঠলেন :

আকাশে তারা উঠেছে—আকাশে তারা উঠেছে—

আজকাল গুরুদেব খুব স্বপ্ন দেখেন। ঘুম ভেঙে গেলেই তক্ষুনি স্বপ্নের কথা আমাদের বলেন। খানিক বাদে তন্দ্রা ভেঙে গেলে বললেন:

তুই যেন বলছিলি যে, 'চলুন আপনার নতুন বাড়ি দেখে আসি গিয়ে।' আমি বললুম—'আমার নতুন বাড়ি—সে তো তৈরি হয়নি এখনো।' বুদ্ধি আমার সচল হয়নি, তাই সব কিছু জড়িয়ে যাচ্ছে। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আমার শরীরে এখন বেশ একটু বল পাচ্ছি—সেই থলথলে ভাবটা নেই।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪০ ; জোড়াসাঁকো

গুরুদেবের বিছানার পাশে আমাদের মেয়েদের মধ্যে কথায় কথায় একজন বলে উঠলেন—"মোটেই নয়—পুরুষেরাই বেশি ঈর্ষাপরায়ণ।" কথাটা গুরুদেব শুনলেন—জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন :

না, নারী করে ঈর্ষা, পুরুষ করে হিংসা।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৪০ ; জোড়াসাঁকো

সকালবেলা গুরুদেবকে বিছানায় শুইয়ে শুইয়ে হাত মুখ ধুইয়ে, চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া হোলো। এখনো তাঁকে উঠিয়ে বসানো হয় না। আজ তিনি বেশ প্রফুল্ল আছেন। সেক্রেটারি তাঁর ঘরে এসে তাঁকে প্রণাম করতে গুরুদেব খুব গম্ভীর ভাব মুখে এনে ততোধিক গম্ভীর স্বরে বললেন :

রবীন্দ্ররচনাবলীর এখনকার "মুখ্য" সংস্করণের খবর কী।

বলামাত্র সেক্রেটারি তাড়াতাড়ি রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন। গুরুদেব তাঁকে ধমকে বলে উঠলেন :

সিলেটি বাঙাল। আমি জানতে চেয়েছিলুম আমার আজ মুখের অবস্থা কী রকম—

বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে দিয়ে।

৯ই জানুয়ারি, ১৯৪১

সকালে "উদয়নে" জাপানিঘরের বারান্দায় গুরুদেবকে এনে কৌচে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ শীত, উলের বোনা পাতলা নীলরঙের শাল দিয়ে কোমর থেকে পা অবধি ঢাকা। সামনের টেবিলে লিখবার সরঞ্জাম। বাগানের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। ওষুধ নিয়ে কাছে যেতে গুরুদেব বললেন :

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে—যা পায়নি, তা নিয়ে কল্পনায় স্বর্গ রচনা করা। আদিম কাল হতে রামায়ণ, মহাভারত যাই বলো না কেন, ঐ একই কথা। যা পাইনি তা নিয়ে কল্পনায় স্বর্গ না রচলে, বাঁচব কী করে। মানুষের বাঁচর্তে হোলে আনন্দ চাই তো? যা সত্যিকারের, যা পেয়েছি, তা জীর্ণ। সেই জীর্ণকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে কি আনন্দ পাবে তুমি। তাই তো মানুষ ছবিতে, গানে, লেখায়, কল্পনাকে মধুর করে তুলতে চেষ্টা করেছে। ছবি, লেখা তবু খানিকটা realism দিয়ে হয়, কিন্তু গান একেবারে অসম্ভব। ধরো না, তুমি মেছোবাজারে গিয়ে মেছুনীদের ঝগড়াটাকে গান করলে। আনন্দ পাবে তাতে? realism খানিকটা চলে; কিন্তু তাকেও ছন্দে-বন্ধে একটা রূপ দিতে হবে

... ...

প্রেস থেকে তাঁর কবিতার একতাড়া প্রুফ এল। তিনি দেখে দিলেন; আবার তা প্রেসে পাঠানো হোলো। একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে গুরুদেব বললেন :

এত লিখেছি জীবনে যে লজ্জা হয় আমার। এত লেখা উচিত হয়নি। ভারতচন্দ্র বলেছেন "সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর"। অবশ্যি সাহিত্যের আগাগোড়াই মিথ্যার উপরে ভিত্তি। যা বলেছি— যা বলি তার কতটুকু সত্যি? জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মড়াইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবুও বাকী থাকবে কিছু। জোর করে বলা যায় না; যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সব চেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই।

... ...

১০ই জানুয়ারি, ১৯৪১ ; উদয়ন

পেনসিলের আঁচড়ে খানদুয়েক ছবি আঁকলেন কিন্তু তাতে তেমন খুশী হোতে পারলেন না তিনি। ছবি দুখানি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে সেই কথাই বললেন :

ছবি আঁকার সব সাজসরঞ্জাম হাতের কাছে না থাকলে আমার ছবি আঁকা হয় না। একটু তুলি, একটু কলম, কালি, রঙ সব মিশিয়ে বড়ো

কাগজে ছবি আঁকতে পারলে তবে কিছু একটা বিদ্‌ঘুটে রকম করে এঁকে কিছু দাঁড় করাতে পারি। নয়তো এ যা হচ্ছে, আজকাল যেমন লিখি তেমনি। এ যেমন অসুস্থ শরীরে কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকা। এ কি আর ছবি আঁকা। পথ চলতে চলতে সব ছড়িয়ে যাওয়া ;—এ সব উচ্ছিষ্ট। আমি যদি সত্যিই আর্টিস্ট হতুম, তবে দিনরাত ঐ নিয়েই পড়ে থাকতুম। আমার হচ্ছে লেখা, লেখাই আমার শিল্প, তাই দিয়ে কথা বুনে বুনে চলেছি।

১১ই জানুয়ারি, ১৯৪১

আজ সকালে গুরুদেব খুব হাসিখুশী ভাবে গল্পগুজব হাসিতামাশা করতে করতে কবিতায় বলে উঠলেন:

ওগো নারী, তুমি অদ্ভুত,
জানি তুমি মরণেরই দূত—
তুমি অদ্ভুত।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৪১ ; উদয়ন, সকাল

এক হিসেবে নারী হচ্ছে, Universal, তোদের স্থান হচ্ছে সৃষ্টির মূলে। দয়া, সেবা, লালনপালন, এতেই তোদের সত্যিকার রূপ প্রকাশ পায়। পুরুষ যেমন বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা নয়। সব নারী মিলিয়ে,—এক নারী। একটা জায়গায় সব মেয়েরাই এক। এই ধর্ না, মেয়েদের হাতের লেখা—দেখলেই বোঝা যাবে যে মেয়ের, এ কেন হয়।

পুরুষের বেলায় তো তা হয় না। এ শুধু এখানে নয়, আমি বিদেশেও দেখেছি। মেয়েদের কেমন একটা peculiarity আছে, যা দেখলেই "মেয়ের" ব'লে ধরা পড়ে। এ বড়ো আশ্চর্য। মেয়েরা হচ্ছে সৃষ্টির জাত। বাইরে থেকে মনে হয় তারা কুনো, কিন্তু আসলে তা নয়। তারা সৃষ্টির গড়ন কাজে বাইরে প্রকৃতিতে কতখানি জুড়ে আছে। এজন্যই পুরাকালে কবিরা মেয়েদের তুলনা করেছে নদী, গাছ, পদ্ম, চাঁদের সঙ্গে; যেখানে সৃষ্টির যোগ আছে।

জন্ম থেকেই মেয়েরা দায়িত্ব নিয়ে জন্মায়। এই দেখ্ না, মেয়েরা জন্মেই হয় ছোটোভাইকে কোলে করে বেড়ায়, নয় দাদামশায়ের কাছে বসে হাওয়া ক'রে মাছি তাড়ায়। কিছু করবার না পায় তো, 'পুতুলের মা' হয়ে বসে থাকে। এই যে নারী-পুরুষের সমন্বয়ে যে সৃষ্টি, তা কতখানি আলাদা। পুরুষ হচ্ছে individualistic। পুরুষরা জন্মায়ই তাদের কর্তৃত্ব করবার spirit নিয়ে, কৌতূহল নিয়ে। দেখ্ না—ছোটো-ছেলের প্রশ্নের অন্ত নেই, তার দুরন্তপনায় অস্থির হোতে হয়। তীর ধনুক নিয়ে লড়াই, তার বড়াইয়ের অন্ত থাকে না। জন্মেই বাইরের জগতকে জানবার স্পৃহা। আজকাল অবশ্যি এর যুগ বদলাচ্ছে। মেয়েরাও পুরুষের মতো উপার্জন করতে, struggle করতে চাইছে। এরও দরকার আছে। তা হচ্ছে তার আত্মরক্ষার উপায়। নয়তো কেবল মেনেই নিতে হয় জীবনভোর। সব কিছু মেনে

নেওয়াও তো সহজ কথা নয়। বাইরের দিক থেকে এই মেনে নেওয়াকে বলে 'অপমান'। কিন্তু আসলে ভিতরে হৃদয়ের দিক থেকে এর মস্ত সম্মান। মেনে নিয়ে যে অপমানকে এরা জয় করে, তার তুল্য সম্মান কোথায় ও কিছুতেই নেই।

... ...

স্নানের কিছু আগে আমাকে গুরুদেব ডেকে পাঠালেন। দৌড়ে গেলুম। তখনো দক্ষিণের বারান্দায় কৌচে বসে আছেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বললেন :

তোকে উপলক্ষ করে বিশ্বের নারীদের লিখেছি। রোগী তোদের কাছে দেবতার মতো। যে নারী কর্তব্যকে নিজের মধ্যে নেয়—তার উপরেই পড়ে বিশ্বের সেবার ভার,—পালনের ভার। সেখানে নারীরা universal। বিশ্বের পালনী শক্তি তোদের মধ্যেই যে আছে।

বলে স্নিগ্ধ হাসি হেসে হাতের কাগজখানি আমাকে দিলেন। দেখি 'নারী' কবিতাটি, নিচে তাঁর নাম লেখা। ভক্তিভরে দু-হাত পেতে কাগজটি নিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলুম।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৪১ ; উদয়ন

মেয়েদেরই উপর ভার পড়েছে জীবরক্ষার। পুরুষ করবে আঘাত, করবে পালন, সে assert করবে আপনাকে। আর মেয়েরা ক্ষমায়, সেবায়, মাধুর্যে ভরে তুলবে সব কিছু। পুরুষের স্বভাবের বর্বরতা সেখানেই, যেখানে সে মেয়েদের এই দান গ্রহণ করতে

পারে না। মেয়েদের এই বিশ্বজনীনতায় একটা মস্ত শক্তি নিহিত আছে—যে শক্তি জীব রক্ষা করছে। এইজন্যেই মেয়েদের এক নাম প্রকৃতি। পুরুষরা আপনাদের assert করে, মেয়েরা তাতে yield করছে, আর তাকে পুরুষরা exploit করে। মেয়েদের এই মেনে-নেওয়াকে পুরুষ নিজের শক্তির নিচে আরও দাবিয়ে রাখে। তাই মেয়েদের এই শক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে তাদের ঘরকন্নায়। সন্তানপালন করা, সংসার দেখা, এই সবেই তারা বাঁধা পড়েছে ও ওখানেই তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ হয়েছে। বিদেশে এটা নেই। মেয়েদের শক্তি বাইরেও অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে। ওখানকার পুরুষরাও মেয়েদের একটা সম্মান দিতে পেরেছে। আমাদের এখানেও যতদিন না আমরা মেয়েদের দানের সেই সম্মান না দিতে পারব ততদিন আমাদের স্বভাবের অসভ্যতা দূর হবে না। এই যে home বলে আমাদের একটা জিনিস, এটি হচ্ছে পরাধীন প্রকৃতির একটা সৃষ্টি। এই home এল বলেই নারী আজ এত পরাধীন, পুরুষ তাকে এত বাঁধতে পারলে। এই homeএর বাঁধনকে আমাদের সমাজ এতখানি ব্যাপ্ত করে রেখেছে যে, এর থেকে ছাড়া পাবার তাদের উপায় নেই। মেয়েদের এই দান আজ সীমাবদ্ধ না থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়বে না, যতদিন না তারা মুক্তি পাবে, স্বাধীন হবে। এটা হচ্ছে বোধ হয় অনেকটা অর্থনৈতিক কারণে। বর্বর জাতিদের মধ্যে তো তা নেই। সাঁওতালদের দেখি, তাদের স্ত্রী-পুরুষে একটা ঐক্য আছে। কেননা, তারা

দুজনেই উপার্জনক্ষম। অথচ মেয়েদের দায়িত্বও মেনে নিয়েছে। য়ুরোপেও সেটা আছে, কারণ সেখানে মেয়েরা homeকে বড়ো করে দেখেনি।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৪১

সকালে গুরুদেবের বসবার জায়গায়—জাপানিঘরের দক্ষিণের বারান্দায় তাঁর চারপাশের টুলটেবিলের উপরে কতকগুলো কালো মাটির ঘড়ায় ক'রে নানা রঙের নানা রকম ফুল সাজিয়ে দিলুম। তিনি স্থির হয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে ফুলগুলো দেখলেন। থেকে থেকে কোলের উপর রাখা ডানহাতের আঙুলগুলি নাড়ছিলেন। খানিকবাদে বললেন :

আচ্ছা, দেখ্, এই যে এরা আমাদের চারদিকে আসে এ কিসের জন্য। মানুষ আছে বলেই না এর অর্থ? আজ যদি মানুষ না থাকত তবে যারা থাকত তারা হয়তো মাড়িয়ে যেত, কেউ বা চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। মানুষের সঙ্গেই এর মিত্রতা।

... ...

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন উদাস দৃষ্টিতে দূরের পানে তাকিয়ে। কিছু পরে বললেন :

সংসারে কিছুই সত্যি নয়। ছেলেবেলায় যে সুখদুঃখ পেয়েছি, তখনকার মতো সত্যি আর কিছুই ছিল না। আজ মনে হচ্ছে তার মতো মিথ্যে আর কিছুই নয়। ছায়ার ছায়া হয়েও তো সে থাকে না। একদিন যে পাত পেড়ে খেয়েছিলুম, তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। তবে কী সত্যি। অথচ এই "না"-টাকেই, এই

মিথ্যেকেই আমরা সত্যি বলি, এখন সেই সত্যিই আবার মিথ্যে হয়ে যায়। এ কত বড়ো ইন্দ্রজাল, বল্ দেখিনি।

১২ই মার্চ, ১৯৪১

দুপুরে কিছু বিশ্রামের পর গুরুদেব কৌচে বসেছেন, কাঁচের জানালার সামনে। উলের চাদর দিয়ে তাঁর হাত পা ঢাকা। বাইরে হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে; গুরুদেবের কাছেই বসেছিলুম—উঠে শাসি টেনে দিলুম। গুরুদেব আজকাল হাওয়া সইতে পারেন না। তাই গায়ের চাদরটাও ভালো করে চারপাশে গুঁজে দিলুম। গুরুদেব বললেন :

শরীরে আমার তাপ কমে আসছে; একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। এই তাপ কমতে কমতে একদিন সব হিম হয়ে যাবে। আর বেশিদিন নয়; সেই দিন এল বলে। আর কেনই বা; ক্লান্ত হয়ে গেছে মন, এবার বিদায় নিলেই হয়।

ব'লেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। গুরুদেবের এই নিস্তব্ধ বিমর্ষ ভাব সইতে পারা যায় না। কথা তুলে প্রসঙ্গ পালটে দিই —ভেবে ছবির কথা পাড়লুম। ছবি আঁকতে পেলে গুরুদেব ছোটো শিশুর মতো খুশিতে ভরে ওঠেন। অনেকদিন ছবি আঁকেননি এবারে, তাই ওঁর দুঃখ হয় মাঝে মাঝে।

ছবি আঁকা আর আমার হচ্ছে না। তুই আঁকছিস আজকাল? ওটার অভ্যেস রাখিস। ঐতেই তোর বিকাশ। তবু ভালো, তোর একটা পথ আছে। আমি কি আর ছবি আঁকি। শুধু আঁচর-মাচর কাটি। নন্দলাল তো আমাকে শেখালে না; কত বললুম। ও হেসে চুপ করে থাকে—

ব'লে নিজেও হাসলেন।

এমন সময়ে প্রেস থেকে প্রুফ এল। হাতে নিয়ে খানিক নেড়েচেড়ে কোলের উপরে রেখে দিলেন।

লিখে লিখে আর পারিনে। দেখ্ না, আবার একটা ছোটো গল্পের বই বের হবে। আঠারোটা গল্প তো লেখা হয়ে গেল—না? এই শরীরেও হচ্ছে, সবই একটু একটু ক'রে। কবিতা হচ্ছে, গল্প হচ্ছে, না হচ্ছে কী বল্। এক রকম করে সব কিছুই লিখে যাচ্ছি। এবারে তো থামা উচিত। আমার নিজেরও মনে হয়, এটা অসভ্যতা। এত লেখা উচিত হয়নি আমার। শরীর খারাপ, তবু লিখেই যাচ্ছি। অনেক আগেই এর শেষ হওয়া উচিত ছিল—

বলতে বলতে আবার সেই আগের মতোই বিষণ্ণভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খানিকবাদে যেন ওঁর খেয়াল হোলো যে, কাছে আমি চুপ করে বসে আছি। নিজের বিষণ্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে মুখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন:

অবনের* গল্প আর কিছু লিখেছিস? লিখে নিস। ওমনি করে না বলিয়ে নিলে ও বসে লিখবার ছেলে নয়। অবনের তৈরী খেলনাগুলো দু-তিন জন করে না দেখিয়ে, একটা public exhibition করতে বলিস। খুব ভালো হবে। সবাই দেখুক, অনেক কিছু শেখবার আছে। লোকের সৃষ্টিশক্তির ধারা কত প্রকারে প্রবাহিত হয়,

* শিল্পাচার্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেখ্। ছবি আঁকত, তারপরে এটা থেকে ওটা থেকে, এখন খেলনা করতে শুরু করেছে। তবুও থামতে পারছে না—আমার লেখার মতো। না,—অবনের সৃজনীশক্তি অদ্ভুত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিৎ আমারি—অবন, আর যা-ই করুক—গান গাইতে পারে না—সেখানে ওকে হার মানতেই হবে--

এই বলে হাসতে লাগলেন।

... ...

খবরের কাগজ এল, গুরুদেব পড়তে লাগলেন। পূর্ববঙ্গে বৃষ্টির বিরাম নেই :

এই দেখ্ না, ভগবান কেমন বাঙালদের পক্ষপাতী; তাদের জল ঢেলে দিচ্ছেন। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে শুকিয়ে মারছেন। সেখানেও হিট্‌লারী আইন, যাকে মারছেন একেবারে শুকিয়ে মারছেন; আর যার সঙ্গে বোঝাপড়া হোলো তাকে গলা জড়িয়ে ধরছেন।

... ...

কাল দোলপূর্ণিমা। বেশি হৈ হৈ করিস নে। কিসের উৎসব। দেশ জুড়ে হাহাকার, ঘরে ঘরে আর্তনাদ, চারদিকে মহামারি—এই কি উৎসবের সময়।

... ...

শরীরটা আর বইতে পারছে না। অথচ দেখ্, হার্ট ঠিক চলছে, নাড়ী ঠিক আছে—"নাইনটি নাইন পয়েণ্ট সিক্স" টেম্পারেচার—সব ঠিক। এই শরীরেও এক জায়গায় হিটলারী চাল চলছে।

... ...

১৪ই মার্চ, ১৯৪১

অনাবৃষ্টিতে এ বছর চারদিকে হাহাকার। গাছপালা সব শুকিয়ে যাচ্ছে—বসন্তের ছোঁয়াচ তাতে লেগেও লাগছে না। ভোর থেকে আজ কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে, গুরুদেবের কানেও পৌঁছল সে-ডাক :

> কোকিল ডাকতে শুরু করেছে, এবারে আমাদের লজ্জা পাবার পালা।

… … …

বৌঠানের* সঙ্গে "গল্পসল্পের" গল্প সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে বললেন :

> এত দুঃখের লেখা আমি আর কখনো লিখিনি। এ যদি "ফেল" করে তবে দুঃখের আর সীমা থাকবে না। বড়ো কষ্ট হয় লিখতে, একটু একটু করে এগোতে। ভাগ্যিস দ্বিতীয়া ছিল আমার পার্শ্ববর্তিনী, ওকে দিয়ে লেখাই।

১লা এপ্রিল, ১৯৪১

মুখে মুখে গুরুদেব বলে যাচ্ছেন—পাশে বসে তা লিখে যাচ্ছি। সেদিনের মতো লেখা শেষ হোলে তিনি বললেন :

> কষ্টের মালা গেঁথে চলেছি জীবনে। আর পারিনে বইতে, এইবারে শেষ বরণ করে তাঁর পায়ে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেব—

এই বলে দু-হাতে এক করে মাথা নুইয়ে কপালে ঠেকালেন।

… … …

এই বয়সেও গুরুদেবের কী সুন্দর নিটোল হাতের গড়ন, গায়ের চামড়া কোথাও একটু কুঁচকে যায়নি। হাত দেখে কে বলবে যে, এই হাত

* কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী।

যাব—তাঁর এত বয়েস। তেল মাখাতে মাখাতে এই কথাই ভাবছিলুম—তিনি হয়তো বুঝলেন তা। তাই হেসে হাতখানি একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে বললেন :

উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পেয়েছিলাম বই কি। নয়তো এখনো চলছে কী করে। আমার নিজেরও উপার্জিত আছে কিছু। যদিও ব্যয় করেছি বিস্তর। এইবারে শেষ ফুঁকে দিয়ে যাব।—

১৪ই এপ্রিল, ১৯৪১

আজ নববর্ষ। এবারে ১লা বৈশাখেই গুরুদেবের জন্মোৎসব হবে—আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল। ভোরবেলা কচি শাল পাতার ঠোঙায় কিছু বেল, জুঁই, কামিনী তুলে উদয়নের দক্ষিণের বারান্দায় গুরুদেবের হাতে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। আজ অনেক আগে থেকেই গুরুদেব বারান্দায় এসে বসেছেন। ফুলের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে তা থেকে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ধীরে ধীরে বললেন :

আজ আমার জীবনের আশি বছর পূর্ণ হোলো। আজ দেখছি পিছন ফিরে—কত বোঝা যে জমা হয়েছে; বোঝা বেড়েই চলেছে।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৪১

সকালে গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। কাছে যেতে বললেন :

আমার আজকালকার কথাগুলো দু-তিন কানে থাকা ভালো। সব কথা তো এখন গুছিয়ে নিজে লিখতে পারিনে—

ব'লেই খুব সম্ভব পূর্ব আলোচনার জের টেনে বলে যেতে লাগলেন :

হেনরি মর্লির মতো শিক্ষক পাওয়া আমার জীবনের

বড়ো একটা সৌভাগ্য। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল নতুন ধরনের। তিনি কখনো শব্দের অর্থ করে করে পড়াতেন না। পাঠ্য বিষয় তিনি ক্লাসে এমন ভাবে আবৃত্তি ক'রে যেতেন, যাতে ক'রে তার বিষয়বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হোত না। তাঁর আবৃত্তির মধ্যেই তিনি যা বোঝাতে চাইতেন তা পরিষ্কার ফুটে উঠত। আমরা তারপরে বই নিয়ে ঘরে বসে আলোচনা করতুম, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা দিতুম; পাঠ্যবিষয় বুঝতে আমাদের কোথাও কোনো কষ্ট হোত না। এমনিই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার ক্ষমতা বা পদ্ধতি। তিনি আর-একটা করতেন—সপ্তাহের একটি বিশেষ নির্ধারিত দিনে ছেলেরা নাম না দিয়ে প্রবন্ধ বা কিছু লিখে তাঁর ডেস্কে লুকিয়ে রেখে আসত। তিনি বাড়ি গিয়ে পড়তেন ও একটি বিশেষ দিনে ক্লাসে সেই সব লেখার সমালোচনা করতেন। আমরা সবাই সেই দিনটির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতুম। তিনি কখনো কারো লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে কাউকে আঘাত করতেন না, কারণ তাঁর মনে করুণা ছিল। শুধু একদিন তার ব্যতিক্রম হয়েছিল। একটি ভারতীয় ছাত্র ইংরেজদের স্তুতিবাদ ক'রে ও সেই তুলনায় নিজেদের স্বজাতীয় নিকৃষ্টতা দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তাঁর ডেস্কে রেখে আসে। হেনরি মর্লি সেই প্রবন্ধ প'ড়ে খুব রেগে যান। তিনি সেদিন ক্লাসে এসে সেই প্রবন্ধটির তীব্র নিন্দা করেন এবং তিনি বলেন, এতে যে ইংরেজদের স্তুতি করা হয়েছে, তাতে যেন কোনো সত্যিকারের

ইংরেজ খুশী না হয়। সেদিন তাঁর মন অপ্রসন্ন ছিল বলে সেই প্রবন্ধটির ভাষার ও রচনার সমালোচনা করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল আমরাই না তাঁর লক্ষ্যগোচর হই। তারপর বাধ্য হয়ে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয় সেই লজ্জা ঢাকবার জন্য। মেজদা একবার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন "ভারতবর্ষে ইংরেজ" সম্বন্ধে। তাতে ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের ব্যবহার সম্বন্ধে সব তথ্য। আমি অনেকটা তারই উপর লক্ষ্য রেখে ও কিছু রং চড়িয়ে ইংরেজদের নিন্দে করে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তাঁর ডেস্কে চালান করে দিলুম। তারপরের দিনগুলি ভয়ে ভয়ে নিজের ভাগ্য গণনা করতে লাগলুম। যেদিন সেই বিশেষ দিনটি এল, সেদিন আমি পলাতক। ভয়, কী জানি কী হয় আজ। সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালুম। বিকেলে এক জায়গায় বসে আছি, হঠাৎ দেখি পিঠে এক চাপড়। আমার বন্ধু লোকেন পালিত উল্লসিত হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'ওহে তোমার আজ জয় জয়কার। হেনরি মর্লি তোমার প্রবন্ধের অজস্র প্রশংসা করলেন। কী তোমার বিষয়বস্তুর, কী তোমার লেখার ভঙ্গীর, কী তোমার ভাষার।' এবং তিনি ক্লাসে যে সব ইংরেজ ছাত্র ছিল তাদের উদ্দেশ্যে বললেন 'তোমরা হয়তো অনেকেই পরে ভারতবর্ষে যাবে কিন্তু আজকের দিনে এই যে ভারতীয় ছেলেটি ইংরেজদের ব্যবহার সম্বন্ধে যা বললে তা যেন

কোনোদিন ভুলো না। আর তাদের সম্বন্ধে যেন কোনো অসম্মান না থাকে।'

সেদিনের মতো এমন সত্যিকারের প্রশংসা জীবনে আমি পাইনি। অনেক খ্যাতি—বিদেশের ও দেশের আমি হারিয়েছি—সাক্ষ্যের অভাবে। যে সব খ্যাতি পেয়েছি অনেক সময়ে তার সাক্ষী ছিল না। তার জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখ হয় বই কি। দেশে একবার পেয়েছিলুম সম্মান বঙ্কিমের কাছ থেকে। তখন সবে "বৌঠাকুরানীর হাট" লিখেছি। এখন মনে হয় কত কাঁচা লেখা ছিল তখনকার কালে। কিন্তু "বৌঠাকুরানীর হাট" প'ড়ে বঙ্কিম তখন আমাকে একটা চিঠি লিখলেন আমার লেখার প্রশংসা ক'রে ও আমার ভবিষ্যতের সাফল্য অনুমান ক'রে। সেই চিঠিখানা আমাদের কোনো আত্মীয়ের এক বন্ধুর হাতে যায়; তারপরে সেই চিঠির অন্তর্ধান। আমি আর দ্বিতীয় বার তা দেখলুম না। আর-একবার রমেশ দত্তের মেয়ের বিয়েতে—যেই মেয়ের বিয়ে হয়েছিল প্রমথনাথ বসুর সঙ্গে—গিয়েছি। দরজায় ঢুকতে যাব এমন সময়ে রমেশবাবু বঙ্কিমের গলায় মালা দিচ্ছিলেন। বঙ্কিম আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আমাকে মালা পরাবেন না, এ মালা রবিকে পরান।' তারপর রমেশ দত্তকে বললেন, 'Collins-এর Evening বলে কবিতাটি পড়েছেন? রবি যে 'সন্ধ্যা' বলে কবিতা লিখেছে, তা অনেক ভালো'—বলে সেই মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলেন।

সাহিত্যজীবনে সর্বোচ্চ পুরস্কার আমি পেয়েছিলুম সেদিন বঙ্কিমের কাছ থেকে।

দুপুর

আশ্চর্য হয়ে যাই দেখে; কিছুতেই আর ধৈর্যের বিচ্যুতি ঘটে না তোমাদের। মেয়েদের সেবার মধ্যে একটা dignity আছে, তাই তাতে কোনো অসম্মান নেই। তাইতো পুরুষের সেবা নিতে পারিনে।—

কথায় কথায় আধুনিক কালের মেয়েদের কথা হোতে গুরুদেব হেসে বললেন:

আমাদের কালে মেয়ে বলে যেন কিছুই ছিল না। মেয়ে বলে যে কিছু আছে জগতে তা বুঝতেই পারতুম না। এক রকম ছিলুম মন্দ না। এক যা বৌঠানের একটু আদর যত্ন পেয়েছি; ঐ একটি মেয়ের ভিতর দিয়েই মেয়েজাতকে চিনেছিলুম। তখন মেয়েরা এমনি দুর্লভ বস্তু ছিল। কিন্তু এখনো দেখছি—মেয়ে নেই। মেয়েরা গেল কোথায়।

ব'লে ভুরু দুটি কপালে টেনে চোখদুটি বড়ো করে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। বুঝলুম খোঁচাটা কোথায়, তবু তাঁর ভঙ্গী দেখে না হেসে পারলুম না।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৪১

এত যে লিখেছি জীবনে—কেন। তাই এক-এক সময়ে মনে হয় যে, হয়তো ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। তাই লেখার পর লেখা জড়ো হয়েছে। এই

বয়সে একটা যদি পরিবর্তন এসে থাকে, তা হচ্ছে এই যে, নিজের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছি।

... ...

২০শে এপ্রিল, ১৯৪১

এই তো আশ্চর্য—মেয়েরা থাকে ভিতরে, ভিতর থেকেই তারা সব চালায়—প্রেরণা দেয়; আর পুরুষেরা বাহবা নেয়। প্রাণের প্রভাব আসছে কিন্তু ভিতর থেকে মেয়েদের কাছ হতেই। এখানেই তফাত প্রাণের ক্রিয়ার আর যন্ত্রের ক্রিয়ার। বাইরে থেকে যন্ত্রটাই চোখে পড়ে; তার ঘ্যাড়্ ঘ্যাড়্ শব্দ চলছে অনবরত; আর প্রাণের ক্রিয়া নিঃশব্দে ভিতর থেকে তার প্রভাব বিস্তার করছে। সত্যিকারের শক্তি আসছে মেয়েদের কাছ থেকেই। তারা নিজেরাই জানে না অনেক সময় তাদের ক্ষমতা। এই জানা অজানার ভিতর দিয়েই তারা আনছে শক্তি, সৌন্দর্য, সাহস। ভিতর থেকে তাদেরই প্রভাব তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে বাইরে। পুরুষদের শক্তি মেয়েদের কাছ থেকে না এসে উপায় কী। শিশুকাল থেকেই তো মা ছেলেকে নিজের প্রভাবের দ্বারা চালিত করছে। বড়ো হয়েও পুরুষরা সেই মেয়েদেরই প্রভাবে চলে আসছে—এড়াবার উপায় নেই। আমি এই কথাই সেদিন'—'কে বললুম যে, তোমরা মনে করো ব্রাহ্মগার্ল স্কুলে না পড়লে বা লেখাপড়া না শিখলে মেয়েদের প্রেরণা দেবার শক্তি হয় না। তা ভুল। প্রত্যেক মেয়েরই তা আছে। যদি কোনো মেয়ের সেই ক্ষমতা না থাকে, তবে

সেই মেয়েকেই দোষ দিয়ো। কাজেই এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত মেয়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই ; বরং অনেক সময়ে শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেই এর অভাব দেখা যায়। তারা যখন বাইরে আসে—আসে দণ্ডধারী রূপে ; হাতে দণ্ড নিয়ে। আমাদের গগনদের মা ছিলেন, যাঁকে ভুলেও শিক্ষিতা বলা যায় না, কিন্তু কী সাহস আর কী বুদ্ধিতে তিনি চালিয়ে ছিলেন সবাইকে। তিন-তিনটি ছেলেকে কী ভাবে মানুষ করে তুললেন। তিনি তো কখনো জোর করে নিজের ইচ্ছে জানাতেন না, বা প্রকাশ্যে তাঁর শক্তি দেখিয়ে আশ্চর্য করে দেবার বাসনা ছিল না। তবু তাঁরি ইচ্ছায় তাঁরই প্রাণের প্রভাবে ছেলেরা চলেছে। কারো ক্ষমতা ছিল না, তাঁর প্রতিবাদ করা। ছেলেরা তাদের মাকে যা ভক্তি করে অমন সচরাচর দেখা যায় না। তিনি শুধু ছেলে মানুষই করেন নি।—তখন তাঁদের জমিদারির অবস্থা ছিল সংকটাপন্ন—তলায় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। অবনের মা সেই অবস্থায় জমিদারি নিজের হাতে নিলেন, নিয়ে শুধু তাকে ঋণমুক্ত করলেন তা নয় ; একেবারে নতুন করে দিলেন। শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার মধ্যে যদি তফাত থাকে তবে এটা কী করে সম্ভব হয়। অথচ এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

... ...

মেয়েরাই পারে ; তারা সুসংযত শক্তির প্রভাবে বিরোধ ঘুচিয়ে দেয়, অসামঞ্জস্য সরিয়ে রাখে। instinctটা মেয়েদের ভিতরে এমন ভাবে অন্তরে গিয়ে

শিকড় গেড়েছে যে, সেটা হচ্ছে ওদের অন্তর্নিহিত। ওর থেকে মেয়েদের এড়াবার উপায় নেই। তাই আবার সংস্কারও যখন আসে ওদের পেয়ে বসে, অন্তরের তলদেশে গিয়ে প্রবেশ করে। আর মেয়েদের স্বভাবও এমনি যে, তাকে তাড়াবার কোনো তাড়া নেই। অথচ সেইখানেই আছে তাদের গ্লানি। ঐ সংস্কারের বশীভূত হয়েই মেয়েরা আনে অজ্ঞতা, মূঢ়তা। এ গ্লানি দূর করবার পথ নেই। এর শিকড় আমূল উৎপাটন না করলে উপায় নেই। যে পুরুষরাও এর বশীভূত, তারা কি পুরুষ। আমাদের দেশে কটাই বা পুরুষ আছে। এই সংস্কার সমস্ত সমাজকে পিছিয়ে রেখেছে, মস্ত বড়ো ভার হয়ে আছে; এ থাকবেই, যুগে যুগে অন্যেরা এগিয়ে যাবে, আর এরা থাকবে পিছিয়ে প'ড়ে; উপায় নেই। এর চাইতে আমি মনে করি শিক্ষার দ্বারা সহজবুদ্ধিতে চলা ঢের ভালো।

... ...

সব মানুষই instinct নিয়ে জন্মায়। সবার ভিতরেই থাকে কামনা, ইচ্ছে। ক্ষুধার অন্ন, এই অন্ন দেহ মন দুই-ই চায়। মানুষের ভিতরে অনেক রকম পশুবৃত্তি আছে যা নির্মল নয়, অথচ প্রবল। যারা ভালো, তারা চায় সেই instinctটাকে জয় করতে। তারা বলে যে, "দেব না এই দুষমনটাকে জয়ী হোতে। এ'কে দাবিয়ে রাখতে হবে।" এইখানেই দরকার হয় শিক্ষার। শিক্ষার দ্বারা instinctকে মার্জিত, সুন্দর,

সংযত সুসভ্য করা যায়। instinctকে মার্জিত করেই সাধক, মুনি, সাধু হোতে পেরেছে। এই জায়গায়ই শিক্ষার প্রয়োজন ; সংস্কারে এ হয় না।

Instinct-এর সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা বা ইচ্ছে সত্যিকারের পুরুষদেরই আছে। মেয়েরা এ পারে না। ঐ জায়গায় মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে আছে। শুধু তাই নয়, সমাজকেও পিছিয়ে রাখছে। একটা জিনিস আমার বড়ো লাগে—এটা আমি বরাবরই দেখে আসছি যে, conscience ব'লে জিনিসটি পুরুষের ভিতরে সর্বদাই জাগ্রত। সে যা করে conscience-এর বশবর্তী হয়ে। এখানে পুরুষে ও মেয়েতে মস্ত তফাত।

২১শে এপ্রিল, ১৯৪১

নানা জায়গা থেকে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' সংখ্যা বের হচ্ছে। সবই আসে গুরুদেবের কাছে এক-এক কপি করে। পাতা উলটে যান, কখনো কিছু বলেন, কখনো বা চুপ করে থাকেন। এমনি একখানি কাগজ হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে গুরুদেব বললেন :

আমাকে এই স্তুতিবাদ, চাটুক্তি করার মানে হয় না। এতে অত্যুক্তি থাকে অনেক। আর—কী লাভ এই প্রশংসায়। আমি বড়ো লোক, বড়ো লেখক, বিশ্ববিখ্যাত : এই সব স্তুতিবাদে আমি লজ্জায় হেঁট হয়ে যাই। সবাই বলে, ভক্তি করে ; হেঁটমাথায় আমাকে গ্রহণ করতে হয়। আমি যে মস্ত বড়োলোক, এ সম্বন্ধে আমি ছাড়া আর কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি ভাবি, কেন, কেন এই সব প্রশংসা—এর মূল্য কী। এর স্থায়িত্বই

বা কতটুকু। চারদিক থেকে এই সব স্তুতিবাদ ভীষ্মের-শরের মতো আমার দিকে নিক্ষেপ হচ্ছে; নিজে লজ্জায় জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি। খ্যাতি স্থায়ী নয়। আজ যা নিয়ে' এত হৈ চৈ করছে, এত প্রশংসা করছে—তারা কী করে জানে যে, এইই সব চেয়ে ভালো, প্রশংসার উপযুক্ত। জীবনে কত বড়োলোক দেখেছি, তাঁদের কত খ্যাতি ছিল এককালে, আজ সেই খ্যাতি কোথায় মিলিয়ে গেছে। সাহিত্য-জীবনে খ্যাতি বড়ো ক্ষণস্থায়ী, পরবর্তী generationএই মিলিয়ে যায়। বিদেশী সাহিত্য-জীবনেও দেখেছি, দীনভাবে খ্যাতি সাহিত্য-প্রাঙ্গণে ধুলোয় লুটোচ্ছে। দু-দিনে খ্যাতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শুধু মুখের কথা নয়; এই মুখের কথা আমাকে পীড়িত করে তোলে। মুখের কথার ব্যবসা আমিও করেছি—করে আসছি; এবং এককালে নিজের লেখার প্রশংসা শুনে গর্বও অনুভব করেছি; ভেবেছি নিজেকে মস্ত একটা কিছু। কিন্তু আজ, আজ জেনেছি এর মতো মিথ্যে আর কিছু নয়। বয়স হয়েছে, অনেক দেখেছি, অনেক জেনেছি। তাই আজ বলি, মুখের কথা—ফাঁকা কথা; তা আর বোলো না। খ্যাতির মোহ আর নেই। আজ নিজের খ্যাতিতে সংকোচ বোধ করি; অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে থাকি। কী হবে এই সব অত্যুক্তি শুনে। প্রীতি, ভালোবাসা দাও। সেই হচ্ছে প্রাণের কথা, সেইখানেই প্রাণ স্পর্শ করে, মনে হয় সত্যিই কিছু পেলুম। আমি যে বড়ো লেখক, বিশ্ববিখ্যাত ইত্যাদি বলো—এর সত্যতার প্রমাণ কী। এ তো কল্পনা।

কল্পনার উপর নির্ভর করা যায় না, দু-দিনেই সব উবে যায়। সংসারের বড়ো জিনিস হচ্ছে প্রীতি, খ্যাতি নয়। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যখন তোমাদের কাছ থেকে প্রীতি, ভালোবাসা পাই। এই ভালোবাসাই হচ্ছে সত্যিকারের জিনিস। ভালোবাসাই স্থায়ী। আমার সৌভাগ্য যে, এই ভালোবাসা আমি অনেক পেয়েছি। ভালোবাসা যোগ্যতা বিচার করে না। যারা ভালোবাসা দিয়েছে—নিজগুণে দিয়েছে, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। তাদের এই বদান্যতায় নিজেকে ধন্য মনে করি। ভালোবাসা যদি ক্ষণস্থায়ীও হয় তবুও বলব যে, এই-ই সত্যি। কেননা, যতটুকু সময়ে সে ভালোবাসা দিচ্ছে তা অকৃত্রিম ভাবেই দিচ্ছে। ভালোবাসার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা থাকে না। আমি এই ভালোবাসাই পেয়েছি জীবনে অনেক,—কী দেশে কী বিদেশে। পেয়েছি নিজের লোকের কাছ থেকে, তার ঢের বেশি পেয়েছি অনাত্মীয়ের কাছ থেকে। আর আজ এও দেখছি, যারা আমার চারদিকে—তিনদিন আগেও যাদের জানতুম না, তারা আমার কত আপনার, ও সত্যিকারের এরাই। আর-সব ছিল দু-দিনের।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৪১ ; উদয়ন, দুপুর

দেশী ও বিদেশী ছবির মূলত তফাত কোথায় এই প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব বললেন :

.. ছবি জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে একটা form-এর harmony, রঙের harmonyর সমাবেশে একটা expres-

sionকে রূপ দেওয়া। তার ধারা বা বাইরের রূপ আলাদা হোক না কেন, মূলত তারা একই। মানুষের প্রত্যেকেরই individual একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রত্যেকেই আলাদা ভাবে দেখছি, বিভিন্নরূপে তার প্রকাশ করছি; কিন্তু সেইটেই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হচ্ছে সেই বিভিন্ন ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে বিভিন্ন ভাষার ভিতর দিয়ে যে আবেদন ফুটিয়ে তোলে সেখানেই হোলো সর্বজনীনতা; সেখানেই eternal humanityর unity দেখা যায়। ধর্ না কেন, একই বিষয়ের ছবি এদেশে এঁকেছে, বিদেশেও এঁকেছে; কিন্তু সত্যিকারের রস দুটোতে একই। সেখানে তো ভাষার তফাতে কিছু আসে যায় না। তাহলে তো আমাদের অজন্তার ছবি দেখে বিদেশীরা মুগ্ধ হোত না, বা ওদের ছবি দেখে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতুম না। সেখানে যেটুকু প্রাণের বিষয়—যা আনন্দ দেয়, যে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই, রস পাই, তা eternal এবং universal। সেখানে জাতিভেদ নেই। ভাষার তফাতে কোনো ক্ষতি করে না। Primitiveরাও তো ছবি এঁকে গিয়েছে, তারা ভাষা জানত না বললেই হয়; কিন্তু তারা যা বোঝাতে চেয়েছে—তারা যে রস পেয়েছে—তাদের সৃষ্টিকাজে তা আমাদের বুঝতে বা রস পেতে তো কোনো কিছু ভাবতে হয় না। Foreign বলেও তেমনি কিছু নেই। যদি কিছু দেখে তুমি বলো যে, না—এ বুঝতে পারলুম না, এ হোলো 'বিরূপ' 'বিদ্রূপ'; সেখানে কোনো কথা ওঠে না। তা ফেলে দাও।

সেখানে প্রমাণ যে, কিছু সে ফোটাতে পারেনি। নয়তো যতই সে foreign হোক না, তোমার তা থেকে রস পেতে ভাবতে হবে না। পাবেই তুমি তা থেকে আনন্দ। আমি ছেলেবেলায় বিদেশী ভাষা ভালো জানতুম না, কিন্তু ওদের সাহিত্য পড়ে গেছি অনবরত, আর বিস্ময়ে আনন্দে বিভোর হয়ে যেতুম ; কেন, না—তার রস গ্রহণ করবার বাধা ছিল না। Art হচ্ছে সেই রসের বাহন। যে জিনিস দেখে আনন্দ পেয়েছি—সেই আনন্দ সেই রস যখন অন্যের ভিতর চালনা করে দেওয়া যায় তাকেই বলে art ; তা তুমি ছবি এঁকেই পারো বা সাহিত্যে—নয় গানে। আমার সৃষ্টিশক্তির ভিতর দিয়ে যে রস, যে আনন্দ আমি পেয়েছি —তা অন্যদের মধ্যেও চালনা করে দিতে পেরেছিলুম। দুঃখ হয় মনে, যখন ভাবি যে, এ স্থায়ী হবে না। একদিন আর এ রস লোকে পাবে না এর থেকে। সাহিত্য বড়ো ক্ষণস্থায়ী। দেখলুম তো—কী দেশের, কী বিদেশের সাহিত্যের অবস্থা। একদিন যাকে নিয়ে লোকে এত হৈ-চৈ করেছে, দু-দিন বাদে মনে হয়েছে তা ছেলেমানুষি। এ থাকে না ; এমনি হোতে বাধ্য। ভাষা যে নদীর কলস্রোতের মতোই, কেবলি যাচ্ছে আর নূতন আসছে। আজকের ভাষা কাল থাকছে না। তাই আমিও মেনে নিয়েছি ; দুঃখ নেই মনে। যতদিন আমি আছি, তারপরে দোরে তোমরা তালা বন্ধ করে দিয়ো—বাতি নিভিয়ে দিয়ো ;—আমার কিছু বলবার থাকবে না।

... .

এক হিসেবে আমার মনে হয় গানটা একটু বেশি স্থায়ী। কেননা, আমি নিজে দেখলুম কিনা—আমি যখন গান গাই—কর্তব্য ভুলে যাই। মনে হয় যে বিরাট harmony—যার সুরে বাঁধা পশু পাখি জীবজগত, সেইখানে যেন গিয়ে খানিকটা পৌঁছুতে পারি। নিজের সুর সেই সুরে মিলিয়ে দিতে পারি। স্থায়ী—হয়তো বা, কিন্তু এ'কে universal বলি কী করে। আমাদের গান তো অন্য জাতির প্রাণ স্পর্শ করতে পারে না। এমন অনেক দেশের গান আছে, শুনলে মনে হয় শেয়াল কুকুরের ঝগড়া। এখানে ভাষার তফাত, রূপের তফাত অনেকখানি দূরত্ব সৃষ্টি করে আছে। এ একটা সত্যিকারের problem। এর উপায় নেই মেনে নেওয়া ছাড়া। তবে সাহিত্যে একটা জিনিস স্থায়ী হোতে পারে। সেটা হচ্ছে যখন ভাষার ভিতর দিয়ে একটা চরিত্রকে ফোটানো যায়। ভাষা বদলালেও সেই চরিত্র বদলাবে না কোনোদিন। যেমন ধরো portrait। এর তো বদল হয় না কখনো। ভাষার সঙ্গে মারা যায় সব গীতিকাব্যগুলি। কেননা, ওর ভিতরে substance নেই কিনা কিছু। সাহিত্য বেশির ভাগ হচ্ছে unsubstantial, তাই ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রস মরে যায়। অথচ দেখো, প্রকৃতিতে ওসব ঝঞ্ঝাট নেই। কৃষ্ণচূড়া—সে কালও যেমন কৃষ্ণচূড়া দিয়েছে,আজও তেমন দিচ্ছে, পরেও তেমনি দেবে। যত মুশকিল এই ভাষা নিয়ে। ছবির এক হিসেবে স্থায়িত্ব তাই অনেক বেশি। চোখের দেখা আর ভাষার দেখার তফাত ঐখানেই। শিল্পী তাদের

সৃষ্টি রেখে যায়; যুগ যুগ ধরে লোকেরা দেখে। আর আমার বেলায়—আমার সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হবে। তাই এক-এক সময়ে ভাবি এত কেন লিখেছি জীবনে। দু-চার কথা লিখে গেলেই তো হোত।

[illegible]শে এপ্রিল, ১৯৪১

দুপুরে গুরুদেব ডেকে পাঠালেন। ঘরে air-conditioning plant চলছে—দরজা, জানালা বন্ধ—ঘর অন্ধকার। খাটের পাশে মাথার কাছের ছোটো টেবিলে একটি টেবিল-বাতি—ঢাকনা দেওয়া। গুরুদেব খাটে শুয়ে আছেন, বুকের উপরে হাত দুখানি জড়ো করা। দেখে মনে হোলো কী যেন চিন্তা করছেন। কাছে যেতে পাশে বসবার ইঙ্গিত করে কালকের দুপুরের আলোচনার জের টেনে বললেন :

দেখ্—কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করেই বলি। একটা জিনিস দেখলুম—সেটা খুব বড়ো কথা, সাহিত্যের দুটো দিক আছে। একদিক হচ্ছে রূপের সৃষ্টি—যা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, যা উপলব্ধি করা যায়। আর-একদিক হচ্ছে রসের অবতারণা।

গীতিকাব্যের অনির্বচনীয়তা ফুটে ওঠে ভাষার ব্যঞ্জনার দ্বারা। ভাষা কালে কালে বদল হয় ও সেই সঙ্গে রসের সৌন্দর্য, গৌরব কমে যায়। একালের রস ভাবীকালের মানুষ পায় না। তার উজ্জ্বলতা তাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। একটা ছোটো কথা ধর্ না কেন, 'চরণ নখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে'; একদিন এই রসের কত উচ্ছ্বাস ছিল। আজ সেখানে একটি চাঁদও নেই, ঘোর অমাবস্যা। সে থাকত, তার পদবিক্ষেপ বুকে

এসে লাগত, যদি সত্যিকারের চরণের ছন্দে তাল মিলিয়ে আসত। প্রাচীন সাহিত্যের-ও অনেক রসের সৃষ্টি তার উজ্জ্বলতা, তার স্বাদ ক্রমেই ম্লান হয়ে আসে; ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হোতে থাকে। এক সময়ের বিশেষ আগ্রহের কাব্য আর-এক যুগের কালে গৌরব রক্ষা করে না। সাহিত্যের বাজারে হ্রাস বৃদ্ধি হোতে থাকে। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির বিনাশ নেই। সাহিত্যে রসের স্বাদ পরিবর্তন হয় কিন্তু যখন সাহিত্যে, নাট্যে একটি জীবনকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া যায়, যখন সেই সৃষ্টির ভিতরে যথার্থ মানবের পরিচয় থাকে,—তার উজ্জ্বলতা কোনোকালে ম্লান হয় না। মানবের চিত্রশালায় সেই জীবনের সৃষ্টি অমর হয়ে থাকবে। সেইটিই সাহিত্যের চিরস্থায়ী দিক। শকুন্তলা,—সে তো মরবে না কোনো দিন। তার সুখ দুঃখও তো কালেকালে যুগে যুগে মানুষের মনকে নাড়া দেবে। শকুন্তলার নাট্যাংশ জীবন্ত হয়ে থাকবে। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, এমন কি শকুনি, সেও তো অমর হয়ে আছে আমাদের কাছে। সেই শকুনি এখনো বসে বসে পাশাই খেলছে, আমরা তার উপরে আজও রাগ করছি। ভাঁড়ুদত্ত, Falstaff—এরা সব আমাদের কাছে সেদিনও যেমন ভাবে দেখা দিয়েছিল আজও তেমনি। তাই বলছি, সাহিত্যের নাট্যশালায় যদি মানবচরিত্রের কোনো যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় তবে তার ধ্রুবত্ব নষ্ট হয় না, কালের সঙ্গে সঙ্গে। তারা চিরকালের মানুষ।

মানব রূপের সত্যতার দ্বারা চিরকাল আপনার সত্য রক্ষা করে। ভাষা আজ উজ্জ্বল না থাকতে পারে, কিন্তু মানব চরিত্রগুলির উজ্জ্বলতা ম্লান হবে না। তাই মানুষের চরিত্রকে যখন সাহিত্য রূপ দেয় তখন তা হারায় না। মানবের যে চিত্র সাহিত্যকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেই চিত্রের সৃষ্টিতে যদি কোনো উজ্জ্বলতা থাকে যাতে করে মানুষকে কোনো না কোনো বিশেষরূপে প্রকাশ করে, তবে তার বিনাশ নেই। কিন্তু রসের সৃষ্টি যেখানে, তার স্থায়িত্ব এক কালের। কবিতার বিশেষ রস ভাষার বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। ভাষার ব্যঞ্জনায় তার রস। তাই তা ভাষা বদলের সঙ্গেই ম্লান হয়ে যায়। তাই আমরা যারা গীতিকাব্যের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করি, আমাদের জানা উচিত যে, এ থাকবে না। এ-কালের স্বাদ অন্যকালে অগ্রহণীয়। এ হোতে বাধ্য। কেননা, ভাষার ব্যঞ্জনায় যে রসের সৃষ্টি করি আমরা, যুগে যুগে তার বদল হচ্ছে। রস থাকতে পারে যদি সেটা জীবনের দান হয়। যদি convention-এর দান হয় তবে থাকবে না। যখন জীবনের সৃষ্টি, তখন তার মার নেই, কিন্তু যখন বিশেষ কালের বিশেষ ভাবালুতার সৃষ্টি—তার আর উপায় নেই। রসের আধার হচ্ছে ভাষা। সেইজন্যই তো বিপদ। তাই ভাষা বদলের সঙ্গেই সব যায়। আমাদের এই ভাষাও বদল হবে, রসও চলে যাবে। আমরা তো ভাষার সৃষ্টি করলুম, ভাষার অনুবর্তী হইনি। কত রকমে মানুষের প্রকাশ। এইজন্য অনেক সময়ে মনে হয় যে, ছবির

মার নেই। তার বিশেষ রেখা, বিশেষ form বদল হোলেও রসের হানি হয় না। ছবিতে শিশু পর্যন্ত কিছু না কিছু একটা পায়। ভাষাতে তো তা নয়। তাই আমার বলবার কথা হচ্ছে এই যে, সাহিত্যে দুটো দিক আছে। একটা দিক—স্থায়ী, আর-একটা দিক অস্থায়ী। কালের সঙ্গে ভাষা বদলাবে, ভাষার সঙ্গে রস পরিবর্তিত হবে। এ না মেনে উপায় নেই।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪১

একজন আধুনিক কবির কবিতার বই গুরুদেব উল্টে পালটে একবার পড়ে গেলেন, বললেন :

এরা কবিতায় এত ধরা দেয় কোন্ সাহসে। অথচ কবিতায় সত্য না থাকলে চলে না। সত্য ফুটে উঠবেই, নয়তো টেঁকে না। আমি তো বুঝি এর ভিতরের কথা, এই কারবার তো করেছি আমিও। নিজের বিরুদ্ধে আগাগোড়া সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। কবিতার বিপদ হচ্ছে—আবার সুবিধেও আছে এই যে, ছন্দের ঘোমটা দিয়ে আড়াল করে এ'কে রাখা যায়। সেই ঘোমটা সরিয়ে সবাই দেখতে পারে না। নয়তো যা বলা হয় অনেক সময়ে কবিতা বলেই সহ্য করে, আর-কিছুতে সহ্য করত না।

৫ই মে, ১৯৪১ : উদয়ন, সকাল

এ সব লেখার বেশ একটা স্বচ্ছন্দ গতি আছে। সহজ কথাতেই তো প্রাণের ভাষা ফুটে বের হয়। আর

সেইটেই হচ্ছে আসল। এতে দেখছি ভাষা প্রাণের অনুবর্তন করে। এই-ই ঠিক রাস্তা! বাঁকা কথা কোনো কাজের নয়। লোকে ভুল করে যখন ভাষাতে অলংকার দিতে যায়। তাতে লাভ হয় যে, তার ভার শুধু বেড়েই যায়। সোজা কথার মার নেই কখনো।

১৪ই মে, ১৯৪১ ; ৩—১৫ মিনিট, সকাল

ভোরবেলা গুরুদেবের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি তখনো ঘুমুচ্ছেন, তাঁর বিছানার পাশে একখানি ছোটো কাগজে লেখা আছে কয়েক লাইন কবিতা। শেষরাত্রে গুরুদেব বলেছেন—কাছে যিনি ছিলেন লিখে রেখেছেন :

রূপ নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগত
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়।
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।

আমি সেখানা নিয়ে কবিতাটি আর-একটি কাগজে বড়ো বড়ো করে লিখে রেখে দিলুম। ছোটো লেখা পড়তে গুরুদেবের কষ্ট হয়।

গুরুদেব জাগলেন; হাত মুখ ধোবার পর কফি খেলেন। পরে কবিতাটি তাঁকে দেখালুম। তিনি কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, আরো কয়েক লাইন লিখে রাখ্ :

সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যায় এ জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করি দিতে।

তারপর বললেন :

আসল কথাটা কী জানিস্, রাত্রি হচ্ছে ঘুমে স্বপ্নে, অন্ধকারে জড়িত। এই স্বপ্ন মানুষের বুদ্ধিকে দুঃখ দিয়ে বেড়ায়। এই কুহেলিকা যখন সরে যায় তখনি দেখা যায় সত্যের রূপ। আমরা রাত্রিবেলায় থাকি সেই কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে। সকাল চাই কেন। কেন থাকি ভোরের আলোর জন্যে উদগ্রীব হয়ে। ভোরের আলো আমাদের প্রাণে আশ্বাস এনে দেয়। পৃথিবীর সত্যরূপ,—বাস্তবরূপ দেখায়। তখন আর ভাবনা থাকে না। সত্য কঠিন, অনেক দুঃখ, দাবি নিয়ে আসে। স্বপ্নে তা তো থাকে না; কিন্তু তবুও আমরা সেই কঠিনকেই ভালোবাসি। ভালোবাসি সেই কঠিনের জন্য সব কিছু দুঃসহ কাজ করতে। এমনি করে জীবনের দেনা শোধ করে চলি আমরা। এই ধর্ না তোর ছেলে,—লাফাচ্ছে, দুড়দাড় করছে, হৈ চৈ করছে, সব কিছু জানতে চাইছে। দিন দিন সে একটা মোহ থেকে এগিয়ে আসছে। জগতের যা সত্য, যা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, জানতে

পারছে। এই তো জীবন। সে সব কিছু আঘাত বেদনা সয়ে সত্যের দিকে এগিয়ে চলবে। তারপর ধর্ না কেন আমার অবস্থা। এ'কে কি বেঁচে থাকা বলে। আমি তো ঘুমিয়ে আছি। মানুষের রোগ, জরা, এসব হচ্ছে কী জানিস? এ হচ্ছে মানুষের শক্তির বিকৃতি. আজ আমি বিছানায় পড়ে আছি তোদের উপর নির্ভর করে। জীর্ণ শরীর, ক্ষীণ কণ্ঠ, বলতেও পারিনে কিছু জোর করে। এই কি আমি চাই। এর চেয়ে ভালো প্রতিদিনের দাবিদাওয়া নিয়ে, জীবনের কর্তব্য নিয়ে চলতে। কঠিন, খুবই কঠিন, কিন্তু সেই কঠিনকেই আমরা ভালোবাসি। সেইখানেই প্রাণের গতি। তবু তোরা বলবি—আপনি বেঁচে থাকুন। কী পারব আর তোদের দিতে। কী-ই বা দিতে পারছি। যা দিতে পারি তার তো অর্ধেকের অর্ধেকও দিতে পারছিনে। তাই বলি যদি আবার আমি এই ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারতুম তবে জীবনে এই দুঃখের তপস্যায় সত্যের দারুণ মূল্য দিয়ে সকল দেনা শোধ করে দিতুম; দিয়ে—মৃত্যুর হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করতুম। নয়তো আমার এ বেঁচে থাকার মূল্য কী। কিছুই নয়।

১৫ই মে, ১৯৪১

— জানিনে এর আগে কার সঙ্গে কী কথা হয়েছে। বড়ো উত্তেজিত গুরুদেবের মুখের ভাবভঙ্গী। কপালের রেখাগুলি ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে প্রণাম করলুম। গুরুদেব কোলের উপর রাখা হাতখানি মুঠোবন্ধ ক'রে জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন :

কবে এরা সভ্য ছিল। আমাদের সঙ্গে ব্যবহারেই তো আমরা বুঝব। কবে না ওরা এসিয়াকে আফ্রিকাকে humiliate করেছে, শোষণ করেছে; শোষণ করে নিজেরা স্ফীত হয়েছে। সেই স্ফীতি দেখে আমরা বলি ওরা সভ্য। আর এদিকে যে আমাদের হাড় বেরিয়ে গেল সেদিকে ফিরে তাকাইনে। অথচ ওদের জন্য দুঃখ করি। মিথ্যে দুঃখ করার মতো অপব্যয় আর নেই। আমাদের যত ভালো ভালো জিনিস কেড়ে নিয়েছে; চীনে বন্ধুদের সর্বনাশ করেছে, হংকং কেড়ে নিয়েছে, আফিং ধরিয়েছে— আবার তার জন্যে তাদের জরিমানাও দিতে হয়। আশ্চর্য হলুম, তারা একটু অভিযোগও করল না; চুপ করে রইল। এ জাতকে ভাবিস তারা মারতে পারবে?

আজ যদি তারা এখান থেকে যায় আমাদের তাতে দুঃখ করবার কী আছে। কী দিয়েছে তারা আমাদের। আর কী দেবে। অথচ মজা দেখ্, যে কুকুরকে চাবুক মারে সেই-ই আবার মুখে লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসে প্রভুর কাছে। আমাদের সর্বনাশ করেছে এরা। আর বাকি রেখেছে কী। এদের টেবিলের কোনা থেকে রুটি ছুঁড়ে দেয় আমাদের খেতে, তাও সবাইকে নয়। তবুও আমরা বলব এরাই হোলো সভ্য জাত? সভ্যই যদি হবে তবে তাদের এই সভ্যতা এত শীঘ্র এমন করে ধুলোয় গড়াবে কেন। সবাই বলে যে সভ্যতা গেল। কোন্ সভ্যতা গেল। সভ্যতা যায় কী করে। সেটা হোলো অন্তরের। এই তো চীনেরা—তাদের সব নিয়েছে, রাজ্য নিয়েছে, কিন্তু সভ্যতা গেছে? কখনো নয়।

১৬ই মে, ১৯৪১

আজ সকালে গুরুদেব অন্য দিনের মতো মুখে মুখে গল্প বলছিলেন, আমি পাশে বসে লিখছিলুম। খানিক বাদে ওঁকে বারান্দা থেকে ঘরে নেবার সময়ে জুতো পরাতে গিয়ে দেখি পায়ে কয়েকটি লাল পিঁপড়ে কামড়ে ধরে আছে। তেলের গন্ধে বোধ হয় পিঁপড়ের আমদানি হয়েছে, কিন্তু গুরুদেব কী নির্বিকার চিত্তে বসে বসে পিঁপড়ের কামড় সহ্য করছেন। আমি কাছে—অথচ একবারটি বললেন না আমাকে। বড়ো দুঃখ হোলো, অপ্রস্তুতও হলাম। গুরুদেব বললেন :

কত বড়ো বড়ো কামড় সহ্য করেছি, আর এ তো পিঁপড়ের কামড়। একবার ভাবলুম বলি তোকে, আমার পায়ের মাধুর্য দেখেছিস? এত মধু পায়ে যে, পিপীলিকারও কত আমদানি হচ্ছে, মাধুর্য গড়িয়ে পড়ছে গো পা দিয়ে। এত মধু যার পায়ে, তার কবিতায় রস, ছন্দ বের হবে না তো-কার কবিতায় বের হবে বল্ দেখি।

১৭ই মে, ১৯৪১ ; সকাল

সমস্যাটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ; তোমাদের উপার্জন করতে দেওয়া হয়নি। পুরুষরা নিয়েছে সেই ভার। তারা উপার্জন করে আনবে। তোমরা থাকবে পরম নিশ্চিন্তে, ঘরকন্না করবে, গোবর ছিঁটোবে ইতুপুজো করবে ; মূঢ়তার চূড়ান্ত করে সংসারে তলিয়ে, যাবে। মনে যা-ই থাক্, বাইরের এই যে বাধ্য-বাধকতা—এই তোমাদের বাধা হয়ে থাকে। অথচ ঠিক সময়ে লুচি ভেজে আনছ—কোন্ লুচি যে ভাজছ সে খবর কেউ জানে না ; জানবার প্রয়োজনও মনে করে না। প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ

নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন। তারপরে আমি যখনই সুবিধে পেয়েছি—বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সতুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।

সন্ধে

বিকেলের দিকে উদয়নের পুবের বারান্দায় গুরুদেবকে এনে একটি কৌচে বসিয়ে দিলুম। আকাশে একটু একটু মেঘ করেছে—সন্ধে হোতে দু-একটা তারাও দেখা দিল। গুরুদেব দু-চার কথার পর বললেন—যদি আমি লেখা অভ্যেস করি তবে উনি খুশী হয়েই কত গল্পের প্লট, এমন কি প্রথম প্রথম কথাগুলিও বলে দেবেন। হাসিমুখে এই সব বলতে বলতে বললেন—একটা গল্পের কথা—যেটা ওঁর লেখা হয়ে ওঠেনি।

গল্পটা আমার মনে এসেছিল যখন সাউথ আমেরিকায় ছিলুম। এখন সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই পরিষ্কার ভাবে মনে আনতে পারছিনে। গল্পটি অনেকটা এই রকম—যেমন—একটা লোক বিয়ে করতে যাচ্ছে, ধর্ যেন পরশু তার বিয়ে, এমন সময়ে আকাশে একটি বাণী শোনা গেল, মানে শূন্য থেকে কথাবার্তা হোতে লাগল—তুমি যে বিয়ে করতে যাচ্ছ, এ কী ভালো হচ্ছে।

ছেলেটি অবাক হয়ে বললে, 'কে তুমি, কেনই বা এ প্রশ্ন করছ। এতে মন্দের কী আছে।

সে বললে, আছে। কারণ আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি জানি বিয়ে জিনিসটা কী। তোমার তা নেই, তাই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি।

তাতে তোমার লাভ ?

লাভ আছে। শোনো, আমার নিজের কথাই শোনো। আমার বিয়ে হয়েছিল একদিন। সবাই বললে— 'ও লো তোর বর খুব সুন্দর। তোর বর পণ্ডিত।' মনে মনে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলুম। যাক, বিয়ে হয়ে গেল। আমি ভাবলুম আমাদের এই মিলনের সূত্র কী। হয়তো আমি সুন্দর, আমার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু আমার আর কিছুই তো নেই। কিন্তু মেয়েদের বেশি কিছুর দরকার হয় না। একটু হাসি, একটু মিষ্টি কথা বলতে পারলেই হোলো। সারাদিন উনি খেটে-খুটে বাড়ি আসতেন, আমি দুটো কথা বলতুম বানিয়ে। দু-দিন চলল, কিন্তু দেখি, কথা ফুরিয়ে গেছে, আর-কিছু বলবার নেই। আস্তে আস্তে ভাঙতে লাগল। মেয়েদের এ-দুঃখের সূত্রপাতের আর অন্ত নেই।

কিন্তু আজকের দিনে আমার মনে এ কী সংশয় ঢোকালে—

তোমার কি আর কিছু মনে পড়ে না। মনে পড়ে না কি কাউকে। আমার তখন পূর্ণযৌবন। তুমি ভুলেছিলে নিজেকে নিয়ে। আমার দিকে তাকাবার অবকাশ ছিল না, কিন্তু আমার যৌবন যে তোমাকে নিয়েই বিকশিত হয়েছিল। ভেবেছিলুম তোমাকে পেতেই হবে। অকস্মাৎ আমার অন্তর্ধান হোলো, কিন্তু আমার বাসনা অতৃপ্ত থেকে গেল। আজ আকাশে-বাতাসে সেই অতৃপ্ত বাসনা কেঁদে বেড়াচ্ছে। একদিন

আমার সবই ছিল। আজ আমার রূপলাবণ্য নেই, যৌবন নেই, আছে শুধু অতৃপ্ত বাসনার হাহাকার। যখন গাছে ফুল ফোটে, বর্ষার মেঘ আমারই মতো কত অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে হাহাকার ক'রে মরে, তা কি তোমাদের কাছে পৌঁছয় না।

কিন্তু আমাকে তুমি কী করতে বলো। তুমি কি মনে করো না যে, আমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, যে আমাকে ভালোবাসে তাকে নিয়ে আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তুমি কি তা চাও না।

কী চাই, আমি জানিনে। আমি হলুম—'না চাওয়া' 'না পাওয়া।' শুধু জানি আমার বাসনার তৃপ্তি হয়নি। সেই ক্ষুধা, সেই অতৃপ্তির হাহাকার দিয়ে আমরা লোকের মনে সংশয় ঢুকিয়ে থাকি। কেন সংশয় ঢোকাই জানিনে, কেবল তাই করি, এই মাত্র জানি। যখন শালগাছে ফুল ফোটে তখন কি তোমার মনে চাওয়া না চাওয়ার মাঝে একটা ব্যথা জাগে না—

একটু থেমে বললেন :

পরে আর ঠিক মনে আসছে না। শেষটায় হবে, ওদের বিয়ে ভেঙে যাবে, বিয়ে আর হবে না। ছেলেটি গিয়ে যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবার কথা তাকে গিয়ে বলবে যে,—আমি কোনো কারণ দেখাতে পারব না, তবে এই মাত্র জানি—মনে সংশয় ঢুকেছে। তোমাকে এখনো ভালোবাসি, কিন্তু গ্রহণ করতে পারব না তোমায়। মনে হচ্ছে তাতে তোমাকে একটা মহা অসুখে অস্বাস্থ্যে নিয়ে ফেলব।

মেয়েটি বলবে—তুমি তো বললে, এখন আমি থাকি কী নিয়ে। ...

আমার বলবার কথা হচ্ছে এই যে, একটা কী আছে—তারা হয়তো সেই অতৃপ্ত বাসনা সমস্ত, যাদের কাজই হচ্ছে কোনো একটা বড়ো কাজে মনে সংশয় ঢুকিয়ে দেওয়া। এটি ইচ্ছে করলে ভুতুড়ে ব্যাপার না করে বাস্তবের মধ্যেও এনে দেখানো যায়। সেই মেয়েটিকে কোথায়ও ছেলেটির সঙ্গে দেখা করিয়ে এই সব কথা বলানো যায়।

... ...

গল্প বলতে বলতে অনেকক্ষণ কাটল। গুমোটও পড়েছে, গুরুদেব বাইরেই বসে থাকতে চাইলেন আরো কিছুক্ষণ। আশায় আছেন আকাশে মেঘ করে আসবে শিগগিরই। কিন্তু ধীরে ধীরে বরং আকাশ আরো পরিষ্কারই হয়ে গেল। গুরুদেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন :

কোথায় বর্ষা—ঘন মেঘ দূর থেকে দেখা যাবে এগিয়ে আসছে, বৃষ্টিতে দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে যাবে—তবে না বর্ষা। এ যেন কৃপণের মতো একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে কী না দিচ্ছে।

কই, সব তারাগুলো তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মেঘটুকু কেটে গেল বুঝি।

২১শে মে, ১৯৪১

ভোর তিনটে থেকে গুরুদেবের ঘরে আজ আমার থাকবার পালা। যখন গেলুম ঘরে তখন উনি ঘুমচ্ছিলেন। জানালা দরজা বন্ধ করেই

রাখতে হয় ঘরের, ভিতরে air-conditioning plant চলে। সাড়ে চারটে নাগাদ গুরুদেব জাগলেন। হাত মুখ ধুইয়ে দিয়ে তাঁকে কোচে বসিয়ে সামনের জানালা খুলে দিতেই তিনি বললেন :

বাঁচলুম, ভোরের আলো দেখলেই যেন প্রাণে আশ্বাস পাই। রাত্রির অন্ধকার আমার ভালো লাগে না মোটেই। কেমন যেন সব কিছুই অন্ধকারে তলিয়ে যায়। তাইতো আশায় থাকি কখন্ ভোর হবে। অন্ধকার কেটে গিয়ে একটা পরিষ্কার রূপ চোখে পড়ে, ভয় কেটে যায়।

... ...

কফি খাওয়ার পর যে নতুন গল্পটি লেখা হচ্ছে, সেটি আগাগোড়া পড়লেন আবার। দু-চার জায়গা একটু আধটু অদল বদল করে বললেন :

দেখলি তো, লেখা জিনিসটা সহজ নয়। কতবার বদলে কত ভাবে কাটাকুটি করে তবে এটি হোলো। লোকে তো তা জানবে না যে, কী করে তৈরি হোলো। তোমাকেও কম খাটালুম এর জন্য ? যাক, তোমার একটি শিক্ষা হচ্ছে এতে। ভাষার দখল খানিকটা এসে যাবে।

... ...

আজ বিকেল থেকে গুরুদেবের মন বড়ো বিষণ্ণ। বিকেলে বাইরে রোদ্দুরের তাপ কমতে তাঁকে উদয়নের পুবের বারান্দায় কৌচে বসিয়ে দিলুম। গুরুদেব হাত দুখানি কোলের উপরে রেখে অনেকক্ষণ অবুধি চুপ করে বসে রইলেন। পরে দু-এক কথায় ছবির কথা হতে তিনি বললেন :

আমার ছবি সম্বন্ধে আমার বড়ো লজ্জা করে। লোকে যখন তার প্রশংসা ক'রে লেখে, আমি তা পড়ে

লজ্জিত হই। তাই আজ যখন '—' ওদের আমার ছবি দেখানো হচ্ছিল—আমার অসোয়াস্তি লাগছিল এই ভেবে —ওরা কি ঠিক বুঝতে পারছে—না পারবে। মিথ্যে কেন কষ্ট দেওয়া।

ছবিটা করেছিলুম এক সময়ে, চুকে গেছে, আর কেন। আজ হঠাৎ দেখি তাই নিয়ে সব কাগজে পত্রে হৈ হৈ, প্রশংসা, সমালোচনা। সাহিত্য, গান কিছুই বাদ নেই। আশ্চর্য হই এমন পরিবর্তন কেন এল। সব যেন ওলোট পালোট হয়ে গেছে।

২২শে মে, ১৯৪১

আমি একটা কথা বুঝতে পারিনে, আমার গল্পগুলিকে কেন গীতধর্মী বলা হয়। এগুলি নেহাত বাস্তব জিনিস। যা দেখেছি, তাই বলেছি। ভেবে বা কল্পনা করে আর-কিছু বলা যেত; কিন্তু তা তো করিনি আমি।

২৩শে মে, ১৯৪১

সকালবেলা মানেই হচ্ছে—সকালবেলা। তাকে আমি ঘণ্টা দিয়ে তার সীমা নির্দিষ্ট করিনে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠে এরা তার অনেকখানি খাবলে নেয়—এদের দিনগুলো এতটুকু। ঘুমেতে, আলস্যে, প্রসাধনে, চোখ বুজে চা খেতে দিনের অনেকখানি চলে যায়। ওদের রাত্তিরটাও তেমনি।

... ...

গুরুদেব মুখে বলে যান, লিখে নিই যা উনি লেখাতে চান; কিন্তু বানান সম্বন্ধে বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকি। আবার ভয়ে ভয়ে থাকি বলেই

বানান ভুল করে বসি। পদ্মাপারের মেয়ে বলেই বিশেষ সাবধান হোতে গিয়ে অনবরত র—ড় নিয়ে বেঘোরে পড়ি আর অনবরতই গুরুদেব হো হো হাসির সঙ্গে তা সংশোধন করেন। সে না হয় হোলো। কয়দিন থেকে শূন্য লিখিতে গিয়ে 'ন'র জায়গায় 'ণ' লিখে বসি। গুরুদেব দেখে দেখে আজকে বোধ হয় আর পারলেন না। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ণ-র মাথাটা চেপে ধরে হাসি মাখা চোখে কৌতুকভরে বলে উঠলেন :

> একে তো শূন্য, তার আবার অত মাথা উঁচু করা কেন।

রোজই প্রায় বানান নিয়ে একটা না একটা ঠাট্টা কৌতুক করেনই আর আমিও সাবধান হোতে গিয়ে আরো ভুল করে ফেলি। তাই গুরুদেব আবার অভয়ও দেন, বলেন :

> বানানে আবার ঠিক ভুল কী। বানান মানেই হচ্ছে —যা বানানো, লিখে যা' সাহস ক'রে। বানান ভুলের জন্য ভয় পাসনে। স—কি—শ এ কেবল ঠিক থাকে একটা বিশেষ গালাগালির সময়ই।

... ...

ভয় হয় অসুস্থ শরীরে কারো সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ আলোচনা করলে বুঝি বা ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। হনও তাই কিন্তু স্বীকার করেন না সব সময়ে। তাই নিজেরাই সাবধানে থাকি ও মাঝে মাঝে তাঁকে সে-কথা মনে করিয়ে দিই।

> কথাতে ক্লান্তি আসে না আমার। কারণ হচ্ছে যে ভাবনাগুলো মনে অনবরত ঘুরপাক খায় তা পরিস্ফুট হয় কথার ভিতর দিয়ে। মনে তৃপ্তি আসে, মনে হয়, যা বলা হয়নি তা বলতে পারলুম। অনেক সময়ে দেখেছি

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে বলতে ভাবগুলি একটা পরিষ্কার প্রত্যক্ষ রূপ নেয় মনে। ক্লান্তি আসে একটানা একঘেয়ে কথা বলতে।

... ...

কয়েকজন অতিথি এসে গুরুদেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে যাবার পর গুরুদেব হেসে বললেন :

জানিস, ওদের ভালো লেগেছে, নতুন গল্পে যেখানে বলেছি—পুরুষ স্ত্রৈণ হয় দুই জাতের। এক হচ্ছে ভালো পুরুষ-স্ত্রৈণ, আর হচ্ছে কাপুরুষ স্ত্রৈণ। মজা এই যে, সবাই মনে করে যে, তারা প্রথম জাতের স্ত্রৈণ। কী বলিস, ঠিক না?

আজ অনেকক্ষণ গুরুদেব একটানা কথা বলে গেছেন তাঁদের সঙ্গে। দুধের গ্লাস তাঁর হাতে দিয়ে সেই কথা বলাতে তিনি বললেন :

ভাষাতেই আমি জিতে যাই। আমার কি আর কিছু আছে। ভাষা দিয়েই আমি ভাসিয়ে দিই।

... ...

মেয়েদের একটা জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে তাদের ভিতরকার জিনিস—emotion। এ যখন একটা character-এর সঙ্গে মিলে রূপ নেয়, তা অতি আশ্চর্য। এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি সত্যিকারের পুজো করতেন বিবেকানন্দকে। তাই তিনি অনায়াসে গ্রহণ করলেন তাঁর ধর্মকে। নিজের দেশ, আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে এলেন এই দেশে। এই দেশকে, এই দেশের লোককে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর

এই ভালোবাসা যে কত সত্যি-কারের তা বলবার নয়। সব কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর এই সাহস, এই আত্মত্যাগ অবাক করে দিয়েছিল আমাকে। আমি নিবেদিতার কাছে প্রায়ই যেতুম। তাঁর যা কিছু ছিল সব গরিব ছেলেদের দিয়ে দিতেন। নিজের চোখে দেখেছি তাঁর ঘরে কলা টানানো থাকত, তাই দিয়ে নিজে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতেন।

মেয়েদের যেটা emotion সেটা যদি শুধু emotionই হয় তবে তা অতি সহজেই বিকৃত হয়, কিন্তু তার মধ্যে যদি একটা character থাকে তবেই হয় তার সত্য প্রতিষ্ঠা।

বিদেশে দেখেছি, তারা যখন ভালোবাসে তখন তার emotionকে একটা রূপ দেয়; একটা কাজের ভিতর দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করে। আমি পেয়েছি বিদেশেও এই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা। সেই স্প্যানিশ মেয়ে—বিজয়া, প্রথমেই আমায় বললে যে, 'আমি তোমার জন্য কী করতে পারি।' আমি যখন ওখান থেকে এলুম তখন সে করলে কী খুব দামী ইটালিয়ান জাহাজে দু-দুটো ক্যাবিন ঠিক করলে আমার জন্যে। আমি বললুম, এর প্রয়োজন কী। কিন্তু সে কিছুতেই মানলে না, বললে, একটাতে তুমি দিনের বেলা কাজ করবে আর-একটা ক্যাবিনে রাত্রে শোবে। এর কারণ আর কিছুই নয়—আমার জন্য কিছু করতে চায়, এই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। একটা সোফা সেটা কিছুতেই ঢোকে না ক্যাবিনের দরজা দিয়ে। কাপ্তেনকে ব'লে দরজা কাটিয়ে বড়ো করে তবে সেই

সোফাকে ক্যাবিনে ঢোকালে। বসে বিশ্রাম করব তাতে।

তারপর দ্বিতীয়বার যখন আবার যাই বিদেশে তখন সেও য়ুরোপে ছিল। সঙ্গে ছিল সেবারে আমার আঁকা ছবিগুলো। সে বললে, 'আমি এগুলো এ দেশের বড়ো বড়ো ক্রিটিকদের দেখাব। সে দেদার টাকা খরচ করে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করলে; একজিবিশন করলে, তাও কত খরচ ক'রে।

তাই দেখেছি যে, বিদেশী মেয়েরা তাদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা করে কাজের মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে। এক রকম ভালোবাসা আছে যা তুলে ধরে, বড়ো করে। আর-একরকম ভালোবাসা আছে—আমাদের দেশে, যেটা মারে, চাপা দিয়ে দেয়।

আমার মনে হয় মেয়েদের কাছ থেকে আমরা যেটা পেতে পারতুম তার অনেকখানি অপব্যয় হয় কেবলমাত্র তার চোখের জলের সীমানার মধ্যে।

২৬শে মে, ১৯৪১

আজ সকালে গুরুদেব কয়েকজন আধুনিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। আমাকে বললেন—আজকাল সব কথা পরিষ্কার মনে থাকে না, অনেক সময় গুছিয়ে আনতে পারি নে, তবু যা বলি নষ্ট যেন না হয়। কাছে বসে শুনে রাখ্:

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই, তোমাদের অর্ঘ্যে তোমরা একটা বিশেষ যুগের আনন্দের স্মৃতি বিচিত্র পন্থায় এনেছ। পণ্ডিতরা বিচার ক'রে সাহিত্যের ভালোমন্দের স্থির

করেন ; কিন্তু তোমরা একত্র করেছ বিশুদ্ধ উপভোগের আনন্দ। খুশী হয়েছ সবাই—একথা তোমরা ভালো করেই বলেছ। আমার কাছে এইটেই খুব ভালো লেগেছে।

আমাদের দেশে যে বলে 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'। এই যে বিশ্বাসে আনন্দ—এটা সহজেই হোতে পারে ; কিন্তু এই ইচ্ছেটাই যে হয় না সব সময়ে। অথচ হোলে পরে সম্পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায়। বিচারের ক্ষেত্র আলাদা ; কিন্তু তাতে অনেকখানি বাদ দিয়ে দেয় সংশয়।

এই যে নতুন একটা তোমরা দিলে, একটা বিশেষ কালে এই যে আনন্দ পেয়েছ এটাই দিলে।

একদিকে রস, অন্যদিকে উপভোগ। যদি মাঝখানে পাণ্ডিত্য আনা যায়, তবে সেটা অন্যরূপ নেয়। তার ক্ষেত্র আলাদা। ভালো লেগেছে ব্যস্, আর কিছু নয়।

আমার গানে গল্পে, কবিতায় নানা রূপ যেটা, তার মধ্যে আমিও সেই অংশই দেখছি, সবার ভালো লাগার রূপ যেটা। . . .

আমার পালা শেষ হয়ে এসেছে। এখন বিদায়ের পালা। আমাদের দেশে বিদায়ের একটা রীতি আছে ;—এখন নেব আমার কবি-বিদায়। এ অনুষ্ঠানকে পাণ্ডিত্য দিয়ে বিকৃত কোরো না তোমরা।

সর্বজনের আনন্দধ্বনি তোমরা সমবেত করেছ। আমার এইটেই মনে লেগেছে যে, সর্বজনের আনন্দধ্বনি

এবারে সমবেত হয়েছে। আনন্দ ভোগ করবার শক্তি আছে বোঝা যায়, তার পরিচয় পেলে পর। সকলের চেয়ে সহজ তাকে মুচড়ে মুচড়ে একটা intellectual জিনিস বের করা। সেটা সবাই করতে পারে। কিন্তু 'ভালো লাগে' বলার একটা টেকনিক আছে। এটাই আমাকে এবারে আকর্ষণ করেছে যে, এই 'ভালো লাগে' বলাটা খুব ভালো করেই বলা হয়েছে। এতে নিজের একটা গৌরব আছে স্বীকার করি; কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। তাই যা বলা হয়েছে, তার বিশিষ্টতা এবারে আমাকে আকর্ষণ করেছে।

সাহিত্যের দুটো ক্ষেত্র আছে, একটা আনন্দের, অন্যটা বিচারের। কিন্তু বিচার করতে ব'সে শুধু যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ঘাটন করি তবে তাতে লাভ নেই।

এখনকার কালে একটা ব্যঙ্গের আবহাওয়া আছে। এবারের এ সব আলোচনায়ও সেটা আসতে পারত, তার চেয়ে নিন্দে ভালো। 'তুমি বোঝো না—আমি বুঝি' এর মধ্যে একটা বিদ্রূপ আছে। এর মধ্যে সেটা নেই। হয়তো পরে আসবে। আমার এই বিদায় গ্রহণের সময়ে আমি কী পেলুম সেটা খণ্ড খণ্ড করে নয়, বিচিত্র দেশ তার সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিয়ে কী দিয়ে আমাকে বিদায় করবে। বিদায়ী কিছু তো দেবে—কী দেবে সবাই আমাকে। তার মধ্যে তো মেকী টাকা দিলে চলবে না।

পরে হয়তো বদলে যাবে কিন্তু 'এখনকার মতো ঠিক হয়েছে'—এইটে যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারো তবে আশ্বাস পাই। এখনকার মতো যদি সেটাই

বুঝতে পারি যে ব্যর্থ হয়নি—যাবার সময়ে তা যদি নিয়ে যেতে পারি তবে বুঝব কিছু পেলুম।

মনে হয় অকস্মাৎ এ কী হোলো। কী করে দেশের সমস্ত মনকে একটা turn দিতে পারলুম যে সবাই আজ নানা দেশে নানা জায়গায় এক হয়ে বলেছে 'ভালো লেগেছে'। এটা সবার ভাগ্যে ঘটে না বলতেই হবে। আমার পক্ষে এটা খুব আনন্দের।

... ...

সমস্ত দেশ, সমস্ত লোক যাবার সময় আমাকে কী করেছে, কী বলেছে। বিশুদ্ধ আনন্দের ধ্বনি করেছে। আমার আশ্চর্য লাগছে যে, সবাই আজ কত ভাবে বলছে যে 'আমরা খুশী হয়েছি।'

... ...

যুগান্তরে আমার ছবি সম্বন্ধে একটা লেখা পড়লুম আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা শক্ত হয়ে উঠল। আমি এর রহস্য বুঝতে পারিনে। তাই যুগান্তর যা বললেন আমি বুঝতে অক্ষম। তেমনি আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখাও জায়গায় জায়গায় আমাকে বিস্ময় লাগায়; রহস্য মনে হয়, বুঝতে পারিনে নিজেকে।

এক সময়ে আমি ছবি আঁকতে বসলুম। আমার অবশ্য একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল—অবন, নন্দলাল ছবি আঁকত—দেখেছি তাদের। কিন্তু আমার মনের ভিতর যেটা এল সেটা কোনো নোটিশ দিয়ে আসেনি। আমাদের দেশে ছবিটা দেখ্‌—আমরা সত্যি পাইনি।

কারণ বাল্যকাল থেকে আমরা তাতে অভ্যস্ত নই। সমালোচকেরা কথায় কথায় বড়ো বড়ো বিদেশী শিল্পীদের নাম করে। তাদের সমালোচনা প'ড়ে যদি বা বুঝি কিছু, কিন্তু তা অন্তরে প্রকাশ করে না। অনেক দিনের দেখার অভ্যেস চাই। কাব্য আমাদের অনেক দিনের, তাই তার রস পেতে দেরি হয় না।

ছবি—সব ছবিই ছবি। ভারতীয়, অজন্তীয় এসমস্ত ছাপ কিছুই নয়। ভিতরের থেকে এল তো এল—না এল তো এল না। ছবি জিনিসটাই হচ্ছে তাই। ভারি শক্ত—ছবি আমাদের দেশ পায়নি। সর্বসাধারণের মধ্যে স্থান পায়নি।

যাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করেন, তারা যখন বলেন আঙ্গিকের কথা, বর্ণবিন্যাসের কথা বুঝতে পারিনে। ছবিতে আমি একটা নতুন দৃষ্টি দিয়েছি একথা এখনকার অনেকেই বলে থাকেন। কী জানি।

২৭শে মে, ১৯৪১

আর্ট কখনো দাগা বুলিয়ে চলে না, নিজেকে সে নিজেই প্রকাশিত করে।

মানুষ আপনার complement চায়। বরাবর চেয়েছে, যার সঙ্গে জোড় মিলবে। বস্তুত, এই একটা রহস্য।

বিধাতা মানুষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সৌন্দর্য দিয়ে; বললেন—ঐটুকু, আর হাত দেব না,

ব্যস্—তোমরা তৈরি করে নাও। এই নিজেকে সম্পূর্ণ করার সাধনাই মানুষের আর্ট।

সৃষ্টি মানে নয় যে অবিকল তার পুনরাবৃত্তি করবে। মাঠে ঘাটে যা দেখি—বিকৃতি, দারিদ্র্য,—সে তো আছেই। আমি তাকে অতিক্রম করে, মিথ্যেই বল্ আর সত্যিই বল্—আর-একটা রূপ দেব অন্য চোখে দেখব। সেকালে রাজপুত্তুর, রাক্ষস এ সবের ছবি করেছে, গল্প বানিয়েছে, এই সব শোনায় মা তার শিশুকে। আধুনিকেরা ভাবে এ সব কী। এখন তারা হাসে যে এ সব বাস্তব নয়; তারা বাস্তব আনছে।

মানব বাস্তব চায়নি। তার ধর্মই এই। অনাদি কাল থেকে মানব অবাস্তবকে চেয়েছে। আজকের দিনে এই কথা যদি বলে সবাই—যে বাস্তবই হচ্ছে আসল—তবে বলব যে মানুষ 'কলা' বলে যা সৃষ্টি করেছে—এ তার বিরুদ্ধ কথা। যারা বর্বর, অসভ্য; যা একটা কিছু সৃষ্টি করেছে অতি ভয়ংকর, বীভৎস,—সেটাও তাদের কল্পনায় একটা রস দেয়। তাকে বর্বর বলতে পারি কিন্তু তাতে একটা আর্ট আছে যা জীবনের ঠিক দাগা বুলিয়ে যায়নি। পাশে পাশে চলেছে জীবনের।

স্বপ্ন ব'লে একটা পদার্থ আছে, বরাবর মানুষ সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছে। আমার হাতেই তা আছে যা পাইনি। শিল্পী তুলি নিয়ে বসল, আপন অন্তরের যা রূপ ফুটিয়ে তুলল। যা বিধাতা পারেননি, আমার হাতে ভার ছিল, তাই দেখিয়েছি। বাস্তবে আছে দারিদ্র্য,

দুঃখ অন্যায়, আছে মলিনতা। মানুষ যা সৃষ্টি করেছে তা সত্য নয়। সেটার জায়গা হচ্ছে সমাজনীতিতে, সাহিত্যে নয়। যদি সত্যই জানা যায় যে সমাজের জীবনের ভিতরে অন্যায় আছে তবে সবাই একত্র হয়ে তাই বলুক, কোমর বেঁধে লাগুক, যে করে মানুষের দুঃখ যায়, খেতে পায়, অপমান দূর হয়। কথা নয়, কথায় কবে কার দুঃখ দূর হয়। এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল। এটা আমাদের কাজ নয়। সে আর একটা দিক আছে। সেখানে যারা লড়ছে, তাঁরা মহৎ, আমাদের প্রণম্য। তাঁরা সব কোমর বেঁধে লাগে, আর এরা আধুনিকরা কী করে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলা কোনো কাজের কথা নয়, ও ঠিক নয়।

শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র আলাদা। মানুষের দুঃখমোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা তাঁরা তো শিল্পী নন, কবি নন; তাঁরা মহাপ্রাণ।

মানুষের দুঃখ, মানুষের দারিদ্র্য ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লিখে দূর করা যায় না—ত্রৈমাসিক, বার্ষিকী বের করে দূর করা যায় না—চাই কাজ; কোমর বেঁধে কাজে লাগা চাই।

স্বপ্ন মানুষের যেখানে, সেখানে সে কবি; সেখানে সে সাহিত্যিক। সাহিত্য ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি যেখানে সাহিত্যিক, সেখানে ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছি। সে আমাকে স্পর্শ করেনি। আমি ইতিহাস উত্তীর্ণ করেছি বলেই আমি রবীন্দ্রনাথ। আমি একক

বলেই আমি কবি। ভালোই করেছিল আমাকে চাকররা ঘরে বন্ধ করে রেখে। তাই সেই নারকেল গাছের পাতায় রোদের ঝলমলানি দেখে মন সাড়া দিত।

আমার রচনায় জীবন—অনৈতিহাসিক জীবন যেটা, তা প্রকাশ পেয়েছে। কালের ইতিহাসকে দেশের ইতিহাসকে আড়াল করে আপনাকে আপনি প্রকাশ করেছে। কাব্য সেখানেই।

আধুনিক সাহিত্যে স্বীকার করি—মানুষের দারিদ্র্যের চূড়ান্ত মূর্তি—খুবই প্রকাশ পেয়েছে। যে-বেদনা স্থির থাকতে দেয় না।

আমি যখন শিলাইদহে পদ্মাতীরে বসে ভাবছি আমি প্রজাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলব; সাহসী করব। কত ভাবে তাদের বুঝিয়েছি। যার ঘরে আগুন লাগে না তারা বাইরে থেকে এসে তার বেদনা বোঝে না, কিছু করতে পারে না, কিন্তু আমি পারিনি। জমিদারিতে আমার অধিকাংশ যা সম্পত্তি সামর্থ্য এই এতেই গেছে। কবিতা লেখা ও কাজ করা এক সঙ্গে হোলে ভালো, কিন্তু হয় কই।

তাই আমি বলেছি যে, আমাকে একটা জায়গা দাও যেখানে আমার কল্পলোককে ফুটিয়ে তুলতে পারি। তারপরে বাকিটুকু আমি যদি অবহেলা করে থাকি, আমাকে গাল দাও।

... ...

আমি বরাবর কতকগুলো কাজ প্রজাদের হাতে

দিতে চেষ্টা করেছি ; দায়িত্ব, স্বাধীনতা দেবার জন্য। যা কোনো জমিদার দেয় না ভয়ে। আমি চেয়েছিলুম ওদের মানুষ করে যাব, কিন্তু আমি পারিনি। আমি যখন দেখতুম প্রজাদের টুকরো টুকরো জমিগুলি সকাল বেলা লাঙল ঘাড়ে নিয়ে এসে চষে যেত—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের ক্ষুদ্র জমিটুকুর কাজ শেষ হয়ে যেত—আমি ওদের বোঝাতে চেষ্টা করতুম,—যদি দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে তবে তাতে কত শ্রম, কত সময় বাঁচে। তারা বুঝত, বলত যে কে এই ভার নেবে। কত ঝগড়া মনোমালিন্য হবে আমাদের। কে সব দায়িত্ব নিয়ে তার মীমাংসা করবে। তাই আমি ভাবলুম, এখনো সময় হয়নি। আস্তে আস্তে আজ যেটা দেখছে সবাই সেটা অনেক দিনের চিন্তার পরে।

ঘরে ব'সে যারা নিন্দে করে, যেটা আমার ভারি লাগে, তারা বলে থাকে রবীন্দ্রনাথ প্রজা শোষণ করেছেন। গিয়ে একবার দেখে তো দেখবে তা কতখানি ভুল। দেবতার মতো ভক্তি করে তারা আমায়।

আমাদের এখন যা কাজ, তা একলা হয় না। কাজের একটা সায়েন্টিফিক ধারা আছে। ধৈর্যের সহিত এই দুঃখ ধীরে ধীরে দূর করতে হবে। ধীরে ধীরে এদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে আপনার প্রতি বিশ্বাস। এ যদি ক্রমে ক্রমে করতে পারি তবেই সার্থক হবে। সকলের মাথায় এ আসে না। যাঁরা পারেন তাঁরা লেগেছেন। একদল লোক আছেন যাঁরা চারদিকের খবর নিয়ে কিসে

এরা পীড়িত অনাহারে ক্লিষ্ট তা গোড়া থেকে দেখে আসছেন। এটা কবিতা নয়। একদিকে কবিতা লেখা, একদিকে কাজ, আমি তাতে রাজী আছি কিন্তু তা তারা করে না।

... ...

আমরা বরাবর নিজের বাড়িতে চিঠিপত্র চলতি ভাষায় লিখেছি, প্রমথ*র লেখার পূর্বেই। আমার বয়স তখন ষোলো যখন ঐ রকম ভাষা ব্যবহার করেছি। নয়তো অভ্যেস হোত না। এখনো ওটা খুব সহজ নয়;— মাঝে মাঝে এক-একটা সংস্কৃত কথা এসে পড়ে। তা আবার ভেবে তাকে সরাতে হয়, না সরালেও ক্ষতি নেই। এখন এই যুগল ধারা চলেছে।

... ...

প্রমথর একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল, বিশেষ রস দিতে পারত, বিশেষ মোচড় দিতে পারত। ওর সাহিত্যের অভিজ্ঞতা খুব বিস্তীর্ণ ছিল। যে রস প্রমথ বরাবর দিয়ে এসেছে—সেই একমাত্র লোক ছিল একসময়ে। গদ্য সাহিত্যে এক সময়ে তাঁর খুবই কৃতিত্ব ছিল। আমরা অপেক্ষা করতুম তাঁর লেখার। প্রমথ'র গল্প কিন্তু সীমাবদ্ধ তাদের মধ্যেই যারা সাহিত্যরসে রসিক। এ-সব জিনিস লোকের রুচি নিয়ে কথা। আমি ও বুঝি।

... ...

* শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—বীরবল

'সভ্যতার সংকট' ভাষার দিক থেকে ভালোই লিখেছি। যদিও অনেক কষ্ট ক'রে কিন্তু ভাষার ব্যবহারটি আমার আত্মসম্মান রক্ষা করেছে। ভাষা আমায় betray করেনি। বলবার কথা তো কতই থাকে মানুষের।

১৬শে মে, ১৯৪১

লোকে যখন বলে 'আশা রাখে'—ঐ আশা রাখাতে একটা তাগিদ আছে। মানুষকে বড়ো বিপদে ফেলে। আশা করাতে যা মুশকিল আনে এমন আর কিছুতে নয়। আমার ছবিতে কেউ আশা করে না কিছু। তাই যা হয়ে যায় তাই ভালো। তা নিয়ে কোনো মারামারি নেই, জবাবদিহি নেই। এই ছোটো লেখাগুলিও তাই।

... ...

গল্পসল্পের গল্পগুলির প্রসঙ্গে হেসে বললেন :

এটা অন্যায়, ছোটো গল্পগুলি ছেলেরা দখল করতে চায়, কিন্তু হাত ফসকে যায়। আসলে এর ভিতরের খবর বড়োদের জন্যই।

... ...

কাল বিকেল থেকে আবার গুরুদেবের গায়ের তাপ বেড়েছে। কয়দিন তাপ কম থাকে—বেশ হাসিখুশি থাকেন, গল্পগুজব করেন। আবার যখন গায়ের তাপ বেড়ে যায়—বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েন—সদাই বিমর্ষ হয়ে থাকেন।

এক-একবার ভাঁটার সময় আসে। অক্ষমতা নেমে

এসেছে। কিছুদিন যাবে আবার সুস্থ হোতে। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, নতুন কিছু ভাববার।

.. ..

আমি দেখেছি—যাদের একটু অনুকূল ভাবে একটু কিছু বলেছি বা করেছি, তাদের প্রতি অন্যদের ঈর্ষা হয়। অন্যদের চেষ্টা তখন হয় এদের দমিয়ে দিতে।

... ...

আমি এতদিন পরে একটি বিষয়ে ভারি খুশী হয়েছি—এইবারের 'পরিচয়ে' একটা accurate সমালোচনা প্রকাশ করেছে। আমাদের দেশের লোকেরা স্বীকার করেনি কখনো যে, আমার ছোটো গল্পগুলির কোনো literary value আছে। Edward Thompson আমাকে বলেছিল যে, তোমার এই গল্পগুলিতে গল্পের যে একটা আসল রস—তা আছে। অন্যান্য লেখার তুলনায় এগুলো অনেক বড়ো।

সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে এ রকম বই খুব কম লিখেছি। বাংলাদেশের যে একটা মাহাত্ম্য আছে—আমার আগে এ আর কেউ দেখেনি এই চোখে। আমাদের দেশের লোকের ধারণা আছে যে, আমি কী করে বুঝব—আমি কি তাদের মধ্যে থেকেছি, দেখেছি। আমি হলুম বড়োলোক; গরিবের বেদনা, দৈনন্দিন সুখদুঃখের ওঠা-নামা—তার আমি কী জানি।

আমি চুপ করেই সব সহ্য করে গেছি। কিন্তু এই ছোটো গল্পগুলিতে বিশেষ একটা recognition আমার

পাওনা ছিল—যা পাইনি এতকাল! এবার 'পরিচয়ে' পেলুম তা।

এই বইগুলির—আমার নিজের কাছে কী মূল্য আছে তা কেউ বুঝতে পারবে না। প্রতিদিনের দৃষ্টি ও আনন্দ সব সংগ্রহ করে তবেই এই গল্পগুলি তৈরি হয়ে উঠেছে। প্রতিক্ষণে চোখে পড়েছে—আর বিস্মিত হয়েছি। এক-একটা ঘটনা দিয়ে আমাদের মানুষের সুখ দুঃখের আন্দোলন—কখনো বা বেদনা, কখনো বা কমেডি—তার একটা ভাব পেয়েছি। এতদিন পরে এই 'পরিচয়ের' সমালোচনায়—এর সম্পূর্ণ যে প্রাপ্য তা দেওয়া হয়েছে।

'গল্পগুচ্ছে' বাংলায় ছোটোগল্পের আমিই আরম্ভ করেছিলুম। তখন 'হিতবাদী'তে পাঁচহপ্তায় পাঁচখানা ছোটো গল্প দিয়েছিলুম। কিন্তু আমাদের এডিটর কৃষ্ণকমল—তিনি বললেন "দেখো রবি, তুমি যা লিখছ এ কি সবাই বুঝতে পারে। আমরা যাদের নিয়ে কারবার করছি, এরা কি কিছু বুঝবে। এ যে high class literature।" হয়তো তখন বঙ্কিমের যুগ বলেই এই গল্প চলল না—তখনকার মাপকাঠিতে যথেষ্ট Romance ছিল না। সে যা-ই হোক, উনি এইটে বলাতে, আমি তখনকার মতো ছোটোগল্প লেখা বন্ধ করে দিলুম। তারপরে যখন 'সাধনা' বের হোলো—তখন আবার অনেকের অনুরোধে শুরু করলুম। আবার সেই ছোটো-গল্পের ধারা খুলে গেল। নয়তো হতাশ হয়ে গল্প লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলুম।

কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয়েছে যে, দেশের লোক আমার গল্পগুলিকে স্বীকার করেনি—এ ভাবটা চলে এসেছিল। একটা মূল্য দিয়েছিল বটে সাহিত্যক্ষেত্রে, একেবারে অবজ্ঞা পায়নি; কিন্তু তার যথার্থ সত্য মূল্য পায়নি। গরিবের ঘরে তো অনেকেই জন্মেছে, কিন্তু তারা দেখেনি—কখনো আমার মতো করে তারা দেখেনি। ছোটোগল্প, বাংলার পল্লীর গল্প—এর আগে আর হয়নি।

তারপর আনমনা ভাবে আপন মনে বলে যেতে লাগলেন :

'ছিন্নপত্র' যখন লিখছিলুম—তারই সঙ্গে স্রোতের শেওলার মতো ছোটো ছোটো দৃশ্য ঘটনা ভেসে এসেছিল, ধরা পড়েছিল প্রতিদিনকার জীবনে। রসে ভরা ছিল এমনতরো দিনগুলো, জীবনে আর আসবে না। বাংলা-দেশের হৃদয়ে আমি প্রবেশ করেছি। হৃদয়ের অতবড়ো দান আর আমার হবে না। তারপরে এলুম এই শুকনো ডাঙায়—এসে লিখলুম 'গল্পসপ্তক।' দেখেছি, দেখিয়েছি সবাইকে তাদের নানা পুজোপার্বণ, বিবাহ, উৎসব, ঘরকন্না। এই প্রত্যহ চলেছে, আমার এই রকম করে গেছে। দেশের কাজ করিনি, বিশ্বের কাজ তো করিইনি। শুধু এই কাজ করেছি, বিশ্বের রস আকর্ষণ করেছি—লোকের চিত্ত থেকে, দেশের মাটি থেকে। অত্যন্ত সত্য যে, সে-রকম করে আর-কেউ তখন দেখেনি।

দুপুর

মানুষের কতকগুলো অহংকারের বিষয় আছে। যেমন আমার গান। আমি জানি সেখানে আমার একটা

বিশেষত্ব আছে। আমি আপনার একটা objective—মনস্তত্ত্বের একটা দৃশ্য পাই। কী রকম করে হৃদয়ে ভেসে উঠছে—কতখানি সত্য, সুখ, দুঃখ idealised করছে। যেখানে সকল বিশ্বের harmony'র মূল—আমার গানে সেখানে পৌঁছুই।

. . . .

গল্প আমি যখন লিখছিলুম, আমি খুব নিমগ্ন ছিলুম। খুব অকিঞ্চিৎকর হয়তো—কিন্তু তার মধ্যে যে মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ সেই feelingটা ওর মধ্যে ছিল। আমার সেই স্পর্শলাভ হয়েছে, যদিও বাইরের থেকে এতকাল সমর্থন পাইনি।

গান সম্বন্ধেও তাই। তখন কত অযত্ন, অবজ্ঞা; হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সবাই। কিন্তু আমি জানতুম বাংলাদেশকে আমার গান গাওয়াবই। সব আমি জোগান দিয়ে গেলুম: ফাঁক নেই। এ না গেয়ে উপায় কী। আমার গান গাইতেই হবে—সব কিছুতে। তাই গান সম্বন্ধে আমার অহংকারের বিষয় আছে। ছবিটা কিন্তু আমার অহংকারের ডিগ্রিতে পৌঁছয়নি। কারণ তাতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার কাছে এমন একটা কিছু প্রকাশ করেছে যা বিশ্বাসের সীমাতে আসিনি। বুঝতে পারিনে।

কিন্তু গানটা শুনলেই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই সুরগুলি কারো কাছে ধার করা নয়। কোথা থেকে এসেছে বলতে পারিনে। কিছু বাছবিচার, ভয়ডর নেই।

আপনার ইচ্ছেমতো গলায় এসেছে—গেয়েছি; গান হয়ে উঠেছে। তাই ফিরে শুনি যখন বিস্মিত হই এবং আমি নিজেকে বলি—'তোমার গান রইল, এ আর কাল অপহরণ করতে পারবে না।'

গল্প সম্বন্ধেও আমি অহংকার করতে পারতুম, কিন্তু বাইরের সমর্থন না পেলে তা হয় না। গানকে আপনার ভিতরে আপনিই চেনা যায়।

আমার কাছে এটাই আশ্চর্য লেগেছে যে, এবারে এরা ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছে। যা আমি চেয়েছি তা প্রকাশ করেছে। সমালোচনার কাজই হচ্ছে লেখককে প্রতিবিম্বিত করা, বিশ্লেষণ করা নয়। সেইটেই পেয়েছি; সেই প্রতিবিম্বতা যে লেখে তাকেও বিস্মিত করে। সেজন্যে একটা খুব খোলাখুলি সমালোচনা এত ভালো লাগে—একটা পরিপূর্ণ সৃষ্টিকল্পনা আর-একজনের ভিতর থেকে দেখা যায়।

... ...

শরতের* একটা বিশেষ ধারা আছে।—ওঁর কারবারই সাধারণত লক্ষ্মীছাড়ার দল নিয়ে। কিন্তু সবই তো তাই নয়। ওঁর একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল—সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা আর-কারো ছিল না।

শরতের ভাষায় একটা জাদু আছে। প্রত্যেকের এক-একটা বিশেষত্ব থাকাই উচিত। বাংলাসাহিত্যে সেইটেই সকলের চেয়ে বড়ো স্থান পেয়েছে আপনিই।

* স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানবজীবনের অনেক বড়ো বড়ো সত্য স্থান পেয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে ওঁর ছোটোগল্পগুলিতে। শরতের কৃতিত্ব—বাংলা-মনোবৃত্তির একটা বিশেষত্ব প্রকাশ করে—মনে হয় খুব নিকটে গিয়ে দেখেছেন।

... ...

নাটক আমরা লিখতে পারিনি। ও মন আমাদের নয়, অর্থাৎ নাটকের যেটা প্রধান গ্রন্থি, যেগুলো দিয়ে সত্যি করে তোলে নাটককে—সে ঠিক আমাদের আয়ত্তে আসে না।

আমার নাটকে অন্তত একটা কল্পলোকের ছায়া আছে; একটা কোণ অধিকার করেছি মাত্র।

কিন্তু আমার ছোটোগল্পগুলো স্রোতের মতো বয়ে গেছে,—বসন্তের ফুলের মতো ফুটে উঠেছে।

... ...

আমার খুব ভালো লাগে তারাশঙ্করের* ছোটোগল্প। তার ভিতরে আছে একটা স্মৃতি—যার সঙ্গে পূর্বেকার ওই যেমন জমিদারদের ঘরে যা ঘটে থাকে শাসন, পালন, শোষণ দেখিয়েছে; খুব সত্য করে তুলেছে তার লেখা।

আধুনিক সাহিত্যে—কতগুলোতে 'সাইকোলোজিকেল প্রবলেম' ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে—এবং কতগুলোতে দেখা যায়, আজকালকার যা স্পর্ধা—তা ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেই planeএ এরা বাস করেনি—শুধু কল্পনা

* গল্পলেখক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

করেছে, পড়েছে। সেটা যদি সত্য হয়ে না ওঠে জীবনে, তবে তা বানিয়ে হয় না। আমি বাঙালীকে একরকম করে দেখেছি, তাদের প্রত্যহের সুখদুঃখ—তা দেখেছি। এটা আমার কাছে খুব মূল্যবান বোধ হয়।

কাব্য আমি জানিনে কোন্‌খানে উঠেছে। অনেকগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছয়নি। হয়তো টেকনিক হয়েছে, ছন্দ নিষ্কলঙ্ক, ছন্দের যেটা music সেটাও পাওয়া যায়; কিন্তু কবিতার ভিতরকার deeper significance যেটা—খুঁজি; এক-এক সময়ে জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা, ভিতর থেকে এমন কী জিনিস তুমি তোমার ভিতরে পেয়েছ যে লিখতে বসেছ। একটা প্রশ্ন আছে। ভাষার একটা অনুপম ঝংকার আছে, ধ্বনি আছে। গাঁথুনির ভিতর দিয়ে নতুন রূপ সৃষ্টি করা —তার একটা প্রয়োজন আছে। মানুষের ইচ্ছার মধ্যে পড়ে সেটা। কেবলমাত্র শব্দের একটা জাদু, সেই moodকে এমন ভাবে প্রকাশ করে—যাতে সেই ক্ষণিকের সাময়িকতা ছাড়িয়ে যায়। সেইখানেই art তৈরি হয়। বাংলা-কাব্যে সেইটিই যে প্রাধান্য লাভ করেছে এ আমার পক্ষে বলা শক্ত। ক্ষণকালের পাওয়া—তাকেও যদি কল্পনায় একটা রূপ দিতে পারা যায়, তারও একটা মূল্য আছে। আরেকটা আছে অনুকরণ—সে কিছুই নয়। ভাষার ঝংকার, ছন্দের বিশেষত্ব—সে কোনো কাজের নয়। কাজের হবে তখনি—যখন ঐ যে আমার কোনো ব্যক্তিগত জীবনের একটা urge একটা রূপকে খুঁজছে—সেই রূপ যদি দিতে পারি।

সংগীত হচ্ছে তাই—কেবলমাত্র এমন একটা moodকে—ক্ষণকালীন সুখদুঃখকে, চিরকালের মতো রেখে গেল—সেইটেই হচ্ছে art।

বাংলাদেশের genius কোন্ রাস্তায় চলেছে। আধুনিকরা সেটাকে স্পর্ধাভরে defy করছে। এইখানেই আমার লাগে। এটাতে একটা নতুনত্বের আবেগ আসে। 'সবাই গুছিয়ে বলে—আমি অসুন্দর করে বলব',—তা বলো। আমি অনেক লিখেছি সুন্দর ভাবে, কিন্তু যদি আমাকে খোঁচা দেয়, আমিও লিখতে পারি ও-ভাবে, কিন্তু ওটা শোভন নয়, ভদ্রজনোচিত নয়।

একসময়ে—আমাদের তখন অল্পবয়েস—বাড়িতে যে সব ছড়াওয়ালারা আসত ও তাদের ছড়া সম্বন্ধে যে আলোচনা হোত—কী ইতর ও অশ্রাব্য ছড়া সব। তবু ভালো লাগত তা তখনকার দিনে। সেই vulgarityর রূপ কি আরেকবার দেখা দিবে। এতে কী মজা।

বাঙালী বরাবর যা করেছে,—সেই সব ছড়া—শুনলে তোমরা কানে হাত দেবে। কিন্তু তা বোধ হয় একেবারে মুছে যায়নি—রক্তে রূপান্তরিত হয়ে আছে। ওই ধরনের ইতর ভাষা ও পরস্পরকে যাচ্ছেতাই করে অপমান করা—এ আমাদের বাংলাদেশে আছে। সেটাই যদি শোভন হয়ে এসেছে—ভদ্রতা শুভ্র বেশে মাথা তুলেছে দেখতুম—তবে খুশী হতুম।

প্রায় প্রত্যেক কাগজে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' সংখ্যাতে গুরুদেবের ছবি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়েছে। তিনি সে সব পড়েন—আশ্চর্য হন

—বলেন,—এমন কী আর আমি আমার ছবিতে দিয়েছি—আমি নিজেও বুঝতে পারিনে—কী নিয়ে সমালোচকরা এত সমালোচনা করছে?—কয়দিন থেকে কত ভাবে সেই সব কথাই বলছেন :

আমার মনে হয় আমাদের দেশে যেটা প্রধান অভাব—আমরা দেখবার সুযোগ পাইনি। ছবি আমরা দেখিনি। রিপ্রোডাকশন দেখেছি কিছু বড়ো বড়ো আর্টিস্টদের ছবির, কিন্তু তা কত তফাত। সেই যে সৃষ্টির লীলা, আমরা কেউ এ না দেখার জন্যে একটা ছোটো সীমানার মধ্যে তা ধরতে পারি মাত্র। একেবারে অভিভূত লাগার উন্মাদনা, আনন্দ—তা হবার জো নেই। নরওয়েতে দেখেছি এক বড়ো আর্টিস্ট মূর্তি গড়েছেন—তার রূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। মানুষ এগুলো কী করে পেরেছে।

আমরা অতি দরিদ্র—আমরা কোথায় যাব। কেউ বা আধুনিকতায় আছে, কেউ বা অজন্তায় আছে; কিন্তু তা' বড়ো কম। তাতে ক'রে inspiration হয় না। ভালোমন্দ বোঝা যায় না।

আমাদের সমালোচকরা যখন সমালোচনা করে, ভাবি চিত্ররাজ্যে কোথায় তাদের অভিজ্ঞতা যে, আমাদের locate করবে। কোথায় তাদের বিচরণ।

আর্ট সম্বন্ধে বা লিটারেচর সম্বন্ধে একথা শুধু বলতে পারা যায় যে, ভালো লাগল কি ভালো লাগল না। নয়তো তাতে অবিচার হয়। যুক্তির চেয়েও বেশি—যে দুটো কথা শুনলেই বুঝতে পারব যে তুমি দেখেছ।

আমাদের দেশে তা দুর্লভ, দোষ দিই না। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় এখানে পৌঁছুতে পারবে।

আমার ছবির বিষয়ে আমার নিজের বলবার কিছুই নেই। আমি কী করেছি, কী বলতে চেয়েছি তা আমিই জানিনে। নন্দলাল* তো আমার ছবি সম্বন্ধে লিখেছে, সে প্রতিদিন আমাকে দেখেছে। সে বলেছে যে, 'আমরা এ থেকে শিক্ষা পাব।' অথচ আমি বুঝিনে কিছু। ফ্রান্সেও বলেছিল যে, অনেকদিন ধরে আমরা যেটা চেষ্টা করেছি, তুমি সেটা পেরেছ। আমি বললুম, 'সেটা কী।' তারা বললে—'তা বললে কি তুমি বুঝতে পারবে।' তাই বলি, এ সব লেখায় তাদের নিজেদের মনেতে যা ভালোমন্দ লাগল—তার ভিতর দিয়ে বলেছে। সেটা শুনতে ভালোই লাগল।—

আমি অবশ্যি অনেক আগে অনেককেই জবাব দিয়েছি—তা ভালোই বলো আর মন্দই বলো—ছবির জন্য এখনো অনেক সবুর করতে হবে আমাদের।

... ...

২৭শে মে, ১৯৪১

আজকাল আমাদের একদল আধুনিক সাহিত্যিক সমাজের 'সর্বহারাদের দুঃখের কথা নিয়ে খুবই লিখছেন। আজ সকালে এই নিয়েই আলোচনা' হচ্ছিল।

কর্মজীবনে আমিও নেমেছিলুম একদিন। হয়তো আমার অনধিকার চর্চা—হয়তো তাতে সার্থকও হইনি—

* শ্রীযুক্ত নন্দলালবসু

ভালো রকম করতে পারিনি। ও তো সত্যি আমার কাজ নয়, কিন্তু বেদনা বেজেছিল বুকে, চুপ করে থাকতে পারিনি।

আজ যারা সাহিত্যের আসরে প্রোলেটেরিয়েট, সর্বহারা—এসব কথা বলে চেঁচাচ্ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—কোন্‌খানে তোমরা কাজ করছ। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা নয়; তোমরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছ? সাহিত্যে এ সব বলার মধ্যে গুণপনা থাকতে পারে—কিন্তু এটা সে-ক্ষেত্র নয়। এখানে হাতেকলমে কাজ করতে হবে।

আমাকে করতে হয়েছে এই কাজ। নিজের জমিদারিতে একদিন আমি তাদের মাঝখানে গিয়ে কাজ করেছি। আমি দূরে থাকিনি—থাকতে পারিনি। কারণ আমি একটা পরিপূর্ণতাকে ভালোবেসেছিলুম। এই দারিদ্র্য, বিচ্ছিন্নতা, মলিনতা—দেখা যায় না; তা আমার কবিত্বকে আঘাত করেছিল। আমাকে নামতে হোলো অবশেষে। আমার যা কিছু সম্বল সামর্থ্য ছিল—সব নিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। যা আমার ছিল তা দিয়ে অনায়াসে এর থেকে দূরে সরে থাকতে পারতুম শহরে, আরামে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে। তা না করে এই করেছি আমি। এটা অহংকার করে বলতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু যখন চারদিক থেকে এই রকম খিচিমিচি করে ওঠে, তখন বলতে ইচ্ছে হয়—আমি করেছি এই কাজ। যদিও তা যৎসামান্য তবুও তো আমি করেছি

এবং তাতে ক'রে কী করেছি—নিজের ক্ষতি করেছি। আমাকে বুর্জোয়া বলে—আমি তো করেছি এই সব কাজ; কিন্তু যারা তা নয়, তারা কী করছে।

... ...

ছবি সম্বন্ধে কয়দিন থেকেই নানা ভাবনা তাঁর মাথায় ঘুরছে। ছবির সত্যকার রূপ কী নানা ভাবে তা বুঝিয়ে বলছেন।

আমাদের আনন্দ হচ্ছে সুস্পষ্ট দেখার। কী দেখলুম তা নয়। এমন কিছু দেখলুম যা সুন্দর অসুন্দরের কথা নয়। সত্য, তার একটা রূপ ছবিতে বরাবর আনন্দ দিয়েছে। একটা উটপাখি বা লম্বা গলাওয়ালা জিরাফ—আমি হয়তো দেখিইনি কোনোদিন, কিন্তু একটা কিছু অদ্ভুত জন্তু এঁকেছি;—মানতেই হবে যে, একটা কিছু অদ্ভুত এতে আছে। এই যে আর্টের একটা দাবি আছে, এমন ক'রে আপনাকে প্রত্যক্ষ করে, তা তুমি যে পন্থীই হও তোমাকে মানতেই হবে।

যা চোখের সামনে আছে, যা প্রতিদিন দেখছি তা যথেষ্ট নয়। একটা বিশেষ কিছু দেখতে হবে, তার সম্মিলনেই এর পরিপূর্ণতা।

আমরা দেখি, কিন্তু indifferently দেখি, তাতে ক'রে সংসারে অর্ধেক জিনিস দেখি, অর্ধেক দেখি না—তাতে চলে না। থেকে থেকে চমক লাগিয়ে দেখানো চাই। গতানুগতিক ভাবে গেলে তো চোখে পড়ে না। মানুষ তাই বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করেছে। আপনার সৃষ্টির নিপুণতায় তাঁকে দৃষ্টির ভিতরে টেনে আনছে।

আর্টের কথা সাধারণ ভাবে যা বলবার তা হচ্ছে—দেখাবে—যা দেখিনি, তা দৃষ্টিগোচর করবে। তাতে আনন্দ আছে। গানটাও তাই। এমন কিছু শোনা, অন্তরের ভিতর থেকে এমন একটা ধ্বনি—যা শুনিনি, পূর্বে পাইনি, তাই যেন সমস্ত অন্তর থেকে এল।

একটা harmonyর উৎস জগতের মাঝখানে কাজ করছে—সেখানে গিয়ে সুরটা লাগল, খুব একটা আনন্দ হোলো। ভারি মিস্টিরিয়াস এই অনুভূতি। সেইখানেই reality, সেই realityই পাওয়া যায়। গানের সুরের ভিতর একটা কিছু স্পর্শ করা, তা একটা অদ্ভুত অনুভূতি। তা কী করে কোন্ ভাষায় বলি—যাতে সবাই বুঝতে পারবে। এখন আর স্পষ্ট করে বোঝাতে পারিনে, শক্তি নেই, ভাষার উপরেও তেমন দখল নেই। হাতড়ে হাতড়ে বেড়াই।

যখন ছবি আঁকতে শুরু করি, আমার একটা পরিবর্তন দেখলুম। দেখলুম গাছের ডালে, পাতায় নানা রকম অদ্ভুত জীবজন্তুর মূর্তি। আগে তা দেখিনি। আগে দেখেছি, বসন্ত এল, ডালে ডালে ফুল ফুটল—এই সব। এ একেবারে নতুন ধরনের দেখা। কিন্তু এই রিয়ালিস্টিক মূর্তি কে দেখালে। আর্ট দেখালে। সে বললে, এ অন্যকেও দেখাতে। এই যে দেখার সম্পদ, এ চারিদিকে বিস্তার করে এসেছে মানুষ। কেন ব'লে ওঠো—'বা'। সুন্দর ব'লে নয়, দেখবার ব'লেই। এইটেই হচ্ছে আমাদের আর্ট। দৃষ্টির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ক'রে

দিচ্ছে। যা দেখেনি, তাকে যখন দেখে—অবাক হয়ে যায়। সেইজন্যই তো প্রত্যক্ষ দেখার এত আনন্দ। এই যে দেখা এ হচ্ছে ছবির দেখা। এক পোলিশ আর্টিস্ট সে একটি অদ্ভুত মূর্তি তৈরি করেছে—যা আমার মতো অথচ আমার মতো নয়। সে কী ক'রে এ করলে। আমাকে নিমন্ত্রণ করলে একদিন তার স্টুডিয়োতে। গেলুম, ঘুরে ফিরে আমি তার নানা কাজ দেখতে লাগলুম, সেও আমাকে নানা ভাবে দেখতে লাগল। প্রথমে আমি কিছুই বুঝিনি। এই গেল প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব—আমি তখন থাকি মিসেস মুডির ওখানে: সে নিজেই নিজেকে নিমন্ত্রণ করে আসতে লাগল। আমায় নানা কথা বলায়, আর আমাকে দেখে। আমাকে দিয়ে এমন কথা বলায় যা আমার বলতে ভালো লাগে। আমিও দেশের নানা কথা ওদেশে তখন বলে বেড়াতুম; সেই সব কথাই বলি। গল্পের ভিতর থেকে মুখ দেখা যায়। সেই মুখ দেখেছে সে—তাই করেছে। কানের কাছে একটা দুঃখীর মুখ দিয়ে দিলে; বুকের কাছে কোথাও কিছু নেই একটা হাঁ-করা কুকুরের মুখ বসিয়ে দিলে—যাতে করে বোঝায় যে আমি সব প্রাণীদের ব্যথা বুঝি। অদ্ভুত মূর্তি সেটি হয়েছে। সবাই দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকানদের সঙ্গে থাকত—গরিব,—তারা দয়া করে ওর ছবি কিনতে চাইত অনেকেই। কিন্তু ও তাতে রাজী হোত না। যা হোক সে কথা—সে একটা

কিছু দেখবার চেষ্টা করেছে।—কী করে দেখা যাবে। ওকে কথা কওয়াও—যা ওর ভালো লাগবে। সেই সব কথাই পাঁচ রকম করে বলিয়েছে। কিন্তু এই সব দেখা ও দেখানো—এই হচ্ছে আসল কথা। কয়জন লোক সত্যিকারের দেখে? অধিকাংশই তা পারে না। যারা পারে তারা দেখায়—আর্টের function হোলো এই।—

ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা হচ্ছে এই, যেমন একটা উট পাখি,—শিল্পী তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়ে যখন মানুষের দৃষ্টিগোচর করে তখনই তা ছবি। মানুষের চোখের সামনে একটা-কিছু ধরা—যা মানুষ প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। ছবি হচ্ছে একটা উপভোগের বস্তু; মানুষ তা ভোগ করে চলবে।

আজ সকালে গুরুদেবের ঘরে আমাতে ও বৌঠানে* কথা হচ্ছিল মেয়ে ও পুরুষের সমান অধিকারের দাবি সম্বন্ধে। গুরুদেবও সেই আলোচনায় যোগ দিলেন।

ও-কথা বোলো না। অনুগ্রহ নিগ্রহের কথা ওঠে না। বেশ তো, মানতে রাজী না হও—মেনো না, কিন্তু 'কী করব' ব'লে পুরুষকে দোষ দিয়ে মাঝামাঝি থাকা ভালো নয়। নিজেদের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে নাও, দেখবে পুরুষরা বাধা দেবে না, বরং সহায় হবে, পাশে এসে দাঁড়াবে। আজকাল আমাদের দেশেও অনেক মেয়ে বেরিয়ে পড়েছে—নিজেদের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে— খুঁজে

* শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী—শান্তিনিকেতনে উনি সর্বসাধারণের মধ্যে বৌঠান নামে পরিচিত।

নিয়েছে। কৈ তাদের তো কেউ অখ্যাত করে না। হয় মানো, নয় মেনো না; কিন্তু দোষ দিয়ো না বা মাঝামাঝি থেকো না—এই হচ্ছে আমার বলবার বিষয়। প্রথমে হয়তো বিদ্রোহ করতে হয়। বিদেশেও দেখেছি তাই, কিন্তু পরে পুরুষেরা জায়গা ছেড়ে দেয়—সরে দাঁড়ায়,—সত্যিকার কাজের ক্ষেত্রে তারা বিরোধ করে না।

২৮শে মে, ১৯৪১

গুরুদেবের বিশ্রাম নেওয়া খুব প্রয়োজন, অথচ যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নেন না। নানা রকম ভাবনা চিন্তায়—লেখার তাগিদে—সারাক্ষণ ভাবিত থাকেন। জোর করে বিশ্রাম নেওয়া সম্বন্ধে তাঁকে বলাতে তিনি বললেন :

তোমরা বলো বিশ্রাম নিতে, কিন্তু মনটাকে বিশ্রাম দিই কী করে। ভগবান মাথা ব'লে একটা জিনিস দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে মন ব'লে পদার্থটাও। এ দুটো অনবরতই ভাবছে। রাত্রে ঘুমুব, তারও উপায় নেই। এই কাল রাত্রেই হঠাৎ কী-একটা problem নিয়ে মাথায় ভাবনা শুরু হোলো—আর কত গণ্ডগোল চলল তাই নিয়ে মাথার ভিতরে। তবুও তোমরা বলবে আপনি ঘুমোন। ভগবান এক-একটা জীব সৃষ্টি করে থাকেন—যাদের বিশ্রাম নেবার হুকুম নেই।

কাল একটা rational স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু ভুলে গেছি সব—কী যেন কার ছেলে মারা গেছে—মানত করেছে দেবতার কাছে—যদি দয়া করেন ইত্যাদি। আমি বললুম কেন এইসব হাত জোড় করে দেবতার উপর ভক্তি দেখিয়ে

তাঁকে অপমান করো। প্রকৃতির নিয়ম সব। দেবতা, দেবতা বলে চীৎকার করা বৃথা, তাঁরা নিস্পৃহ। মানুষের দুঃখ মানুষই দূর করতে পারে—এই সব বলে যাচ্ছি। কিন্তু কেউ শুনলে না। রাত্রিবেলা নাস্তিকতা করার সুবিধে আছে।

... ...

'হার-মানা-হার' যে বুকের ভিতরে আছে তোমাদের, তা ছিনিয়ে নেবে কে। বাইরে যতই বড়াই করুক 'হার মানব না', কিন্তু না মেনে মেয়েদের উপায় কী। বিধাতা যে তোমাদের ভিতরে দিয়ে দিয়েছেন হার মানবার মন্তর।

... ...

এখনকার কালের 'জিনিয়াস'দের প্রমাণ হচ্ছে যে—কিছু বোঝা যায় না। কী করছে তারা, তা বুঝবার উপায় নেই।

... ...

আমরা যখন কোনো মেয়েকে বলি অসাধারণ, তখন সে সত্যিই অসিধারণ করে বসে; শেষে তাতেই তার পতন হয়।

৩০শে মে, ১৯৪১

অসুস্থ শরীরেও গুরুদেব আশ্রমের নানা খুঁটিনাটি বিষয়েও সর্বদা খোঁজখবর নিতেন। একটা জায়গায় যেন কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট হোতে পারছেন না।

গোড়া থেকেই আমি এইটেই চেয়েছিলুম যে, ছেলেরা আপনার দায়িত্ব আপনারা নেবে। এমন কি,

প্রতিদিনের নিয়মগুলি নিজেরাই চালনা করবে। ছাত্ররা নিজেদের উপর নির্ভর করবে সকল বিষয়েই। আমাদের দেশে ছেলেরা মা ও অভিভাবকদের হাতে তৈরি হয়ে স্বভাবতই অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়—সেটা ঘোচাতে হবে। আপনার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করবে। তা ছাড়া, আমি এও ইচ্ছা করেছিলুম যে, বিদ্যালয় পরিচালনার অনেকটা অংশ নিজেদের দায়িত্বে যেন তারা নিতে পারে। আমি বলেছিলুম ছাত্ররা নিজেরা প্রাত্যহিক আইনগুলি আপনারাই মেনে চলবে, সেটার জন্য কারো মুখের দিকে যেন তাদের তাকাতে না হয়। একটা বিষয় আমি যেমন তাদের দেখিয়েছিলুম—রান্নাঘরের ভাতের হাঁড়িটার তলা ক্ষয়ে গিয়েছিল টেনে টেনে নেওয়ার দরুন। ছেলেরা এসে বললে—আমরা কী করব।

আমি বললুম—'তোমরা ভেবে নেও কী উপায় থাকতে পারে। সব বিষয়ে কর্তৃপক্ষদের উপর ছেড়ে দাও কেন। হাঁড়িটার তলা ক্ষয়ে যায়—একটা বিড়ে লাগিয়ে নাও। নিজেদের উপর দায়িত্ব না নিলে ভাবতে শিখবে না, অল্পতেই তোমরা মনে করো এটা কর্তৃপক্ষদের ভাববার কথা। কেন তোমরা এসে নালিশ করবে। যেটা তোমাদের অধিকারের বহির্ভূত, তার কথা আলাদা; কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে যতখানি ভাবা বা করা দরকার, তা তোমরা নিজেরাই করতে শিখবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, বিদ্যালয়ের ভালোমন্দ,

লোকের কাছে খ্যাতি অখ্যাতি—এর দায়িত্ব ছেলেদের। আগে যেমন ছিল—বিদ্যালয়ে কোনো অতিথি এলে তার সব কাজ ও দেখাশোনা ছেলেরা করত। এটার দ্বারা বিদ্যালয়ের যে সাধারণের কাছে একটা প্রতিপত্তি হয়, তাতে তারা গৌরব মনে করত।

ঘরের আশেপাশে জঙ্গল আবর্জনা নিজেরাই পরিষ্কার করবে, বিদ্যালয় যাতে সবদিক থেকে স্বাস্থ্যকর হয়—এটা তারাই দেখবে। এটা যে তাদের বিদ্যালয়, এটাতে যা কিছু ত্রুটি হবে, তাতে যেন তাদেরই আঘাত করবে। নালিশ নয়, তোমরা আপনারা একটা 'বোর্ড' করবে, যদি দেখো কোনো ত্রুটি হচ্ছে, তা আলোচনা করবে—উপায় বের করবে। পারত পক্ষে আমরা হাত দেব না। আগে যেমন ছেলেদেরি একটা বিচারসভা ছিল। এখন তাও একটু প্রসারিত করতে হবে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এই বোধ থাকবে যে,—বিদ্যালয়টা আমাদেরি—এর যশ অপযশও আমাদের। এটাতে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ থাকবে।

কাজের একটা নিয়ম করে তোমরা নিজেরাই তার চালানোর ভার নেবে। নিজের বিষয়সম্পত্তিটি দেখা-শোনার মতো ক'রে আশ্রমটি দেখবে।—

আমাদের দেশে আত্মনির্ভরতা একেবারেই নেই। কিন্তু এই আত্মনির্ভরতাই আমি বিশেষভাবে আমার বিদ্যালয়ে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম—আপনাকে চালনা করবার শক্তি যেন এদের হয়, আর যে-বিদ্যালয়ে পড়ছে—

এটা যে তাদেরই, তা যেন মনে রাখে। তার সীমা কোথায় তা শিক্ষকেরা ঠিক করে দিতে পারেন। তা করতে গেলে তার কর্মের ভার নিতে হবে। জঙ্গল হয়ে থাকবে কেন। হোতে দেবে না। তাদের নিজেদের দৃষ্টিই পড়বে ও তারাই তা হোতে দেবে না। ঘরদোর সব নিয়মমতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে, এটা তাদের নিজেদেরই কাজ।

এই দুটো জিনিসই আমি বিশেষ করে চেয়েছিলুম। আমার মনে আছে কিনা—নতুন কেউ এলে ছেলেরাই তার সব ব্যবস্থা করত। এখন হচ্ছে—তাকে তাড়াবার চেষ্টায় থাকে। আগের দিনে শিক্ষকেরাও আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে আশ্রমের সঙ্গে নিজেদের যোগ রেখেছিলেন। তখনকার আমোদআহ্লাদে ওঁরাই উৎসাহে যোগ দিয়েছেন। এখন দেখছি উলটো, শিক্ষকেরাই সব বিষয়ে সরে দাঁড়ান। আসল কথা, এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। নতুন করে না পুরাতনকে, পুরাতন করে না নতুনকে।

জগদানন্দের এটা ছিল—আশ্রমের সঙ্গে ছিল তাঁর সত্যিকারের আত্মীয়তা। এটা খুব বড়ো জিনিস। চেষ্টা করতে হয় এর জন্যে। সামাজিক আমোদআহ্লাদের ভিতর দিয়েই সেটা হওয়া সম্ভব; তাও আজ তারা করে না।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকের আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে ঘনিষ্ঠভাবে। এখান থেকে যাবার

সময়ে এরা যেন বলতে পারে যে, 'বিদ্যালয়টি আমরা তৈরি করেছি। এতে আমাদের হাত আছে।'—ছাত্রজীবনের মেমোরিয়াল হিসাবে তারা যাবার সময় কোনো-একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন যেন রেখে যায়। নয়তো যারা গেল এখান থেকে—গেলই। সেটা ঠিক নয়—তারা যেন ফিরে ফিরে এসে তাদের স্মৃতি দেখতে পায়।

সকলের চেয়ে ভাঙন ধরেছিল যখন এখানে মেয়েরা এলেন। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের থেকে আলাদা থাকতে বাধ্য হলেন। এই ধরো না—তাঁদের স্ত্রীরা যখন এলেন ভাবলুম যে বেশ ভালোই হোলো। মেয়েরা এখানে আসাতে ক'রে ছেলেদের দেখাশোনা চলবে ভালো, তাদের বাড়ির আত্মীয়স্বজনের অভাব খানিকটা দূর হবে, কিন্তু তা হোলো না। মেয়েরা থাকলে পরে মেলামেশাটা খুব ঘনিষ্ঠ হোতে পারত—তা হয়নি। আমরা সেই মনে করেই এটা welcome করেছিলুম। এখন কি মনে হয় না যে, এতে একটু স্বার্থপরতা ঢুকেছে। কালে কালে পরিবর্তন হয়, অনেক হয়েছে, এখন আর ফিরে যাওয়া যাবে না। কাজেই যতটুকু রাখা যেতে পারে, তাই নিয়ে ভাবো। যতটুকু আত্মীয়তা রাখা যায় তার চেষ্টা করো। যারা এসেছে তাদের কাছে সেটা পাইনি অথচ তাদের অনেকখানি দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। এখনকার দিনে individualটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এগুলো সব আপনার ভিতর থেকে আনা।

আজকাল অত্যধিক অতিথি সমাগম হচ্ছে, সেটাকে

আইন করে কমিয়ে দেওয়া উচিত। বড়ো হওয়ার বিপদ আছে।

আসল কথা—আত্মীয়তা আশ্রমের প্রধান ধর্ম। আর বিচ্ছিন্ন থাকা এখানকার নিয়মবহির্ভূত। নিজঘরে বন্ধ হয়ে আছি, কারো সঙ্গে দেখাশোনা নেই—এটা এখানে চলে না। সবটা হবে না তা জানি—কালের ধর্মও আছে—তবু যতটুকু পারা যায়।

আত্মনির্ভরতা অবশ্যি একালেরই জিনিস। এটা হওয়া খুবই দরকার। মোটামুটিভাবে আমার লেখাতে এ সবই বলেছি। আমার কেবল ঐ ছুটো কথাই ঘুরছিল মাথায়। Principleটা হচ্ছে—সবাইকে আপন করে নেওয়া—ও নিজেকে অপরের করে দেওয়া। এর জন্যে কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করতে হয় না।

রথীকে আমি ষোলোবছর বয়সে কেদার-বদরী পাঠাই। জাপানে পাঠাই ডেক-প্যাসেঞ্জার ক'রে। ছেলেদের সবদিক থেকে সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে ক'রে তারা আত্মনির্ভর হোতে শেখে। মনে করো—রথী গেল শিকারে, ছুটো বেজে যায় তবু ফেরে না। ছোটো-বৌ-র অবশ্যি অনেকটা সয়ে গিয়েছিল এসব, তবু তিনি মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পড়তেন। আমি কিন্তু কোনোদিন রথীকে কিছু বলিনি। শিলাইদহে চলন্ত স্টীমার থেকে নৌকো করে রথী রুটি আনত রোজ। জাহাজের কাপ্তেন এক-একদিন হাউমাউ করত যে, কোন্ দিন কী বিপদ হয়। আমি নির্বিকার থাকতুম। ছেলেদের মনে পদে পদে

বিপদের আশঙ্কা ঢুকিয়ে তাদের ভীরু করে তুলতে চাইনি। এতে করে ছেলেরা নিজেদের নিজেরাই বাঁচিয়ে চলতে শেখে।

৩১শে মে, ১৯৪১

অবনীন্দ্রনাথ-ওঁরা জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবেন সেইরকমই কথা শোনা যাচ্ছে। গুরুদেবও শুনলেন। খুব দুঃখ করে বললেন :

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বলতে Complete Culture-এর একটা জায়গা ছিল। সেই সাঁকো ভেঙে যাওয়াতে মনে বড়ো লাগছে। আমাদের একটা বড়ো সংস্কৃতি ছিল— আচারে ব্যবহারে—সব বিষয়ে। সেইটে জোড়া দিয়ে আমাদের দুই বাড়িকে এক করে সবাই জানত। একটা জায়গা ছিল যেখানে সবাই look up করতে পারত। বিদেশ থেকেও যাঁরা আসতেন, তাঁরাও এসে ওখানে কিছু পেতেন। গগন* গিয়ে অবধি ওটা ভাঙতে শুরু হয়েছে। এখন সব কিছুই নেমে গেছে। আমাদের বাড়িতে সুরেন† ছিল, সেও তো গেছে। এবারে অবশ্যি ওখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। সবই প্রায় নিভে এল—আর কেন।

১লা জুন, ১৯৪১

নতুন ছবি এঁকে গুরুদেবকে দেখালে তিনি খুব খুশী হন। তাই

* শিল্পাচার্য গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

† স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বরাবর যখন যা আঁকি গুরুদেবকে এনে দেখাই। আজও একখানি নতুন আঁকা ছবি এনে দেখালুম। দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন:

যখন সেরে উঠব—তখন আবার তোর মতো এই রকম বড়ো বড়ো ছবি আঁকব।

আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। বললুম ছবি আঁকার সব জোগাড়-জন্তর করে দেব। বড়ো কাগজে পাতলা বোর্ডে মাউন্ট করে দিলে ছবি আঁকতে কোনো কষ্ট হবে না। গুরুদেব খুশী মনে ছবি আঁকার প্রস্তাবে সায় দিতে গিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন:

আর আমি সেরে উঠছি; তুইও যেমন। এইবারে এই রকম করতে করতে আস্তে আস্তে সরে যাব।

বলতে বলতে তাঁর কথার সুর বদলে গেল, দৃষ্টিতে উদাস ভাব এল। বাহিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।—

...   .

দুপুর

গল্পের প্লট সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে গুরুদেব বললেন:

Lifeটা খুব interesting। জীবনে যা-কিছু অভিজ্ঞতা, ঘটনা তা যদি ছবির মতো সাজিয়ে দেওয়া যায়—সেটাই হোলো সত্যিকার রূপ। এর বাইরে গিয়ে গল্প বানানো, কল্পনা নিয়ে সাজানো বড়ো কঠিন। আর তা. তত সুন্দরও হয় না।

৫ই জুন, ১৯৪১

কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম। সূর্যলোকে ঝড় উঠেছে.। সে অবর্ণনীয়। দাউ দাউ করে চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা—গেলুম গেলুম রব।—একটা যেন

প্রলয় কাণ্ড, সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নরকের এমন একটা বীভৎস রূপ সে কল্পনায়ও দেখা যায় না। হয়তো সেদিন শিগগিরই আসছে; আমি আগে থাকতেই দেখে নিলুম।

... ...

একই ঘরে বেশিদিন থাকতে গুরুদেবের আর ভালো লাগছে না। কয়দিন থেকে 'উদীচী'তে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ অবস্থায় উদীচীর ছোটো ঘরে গুরুদেবের থাকার অসুবিধা অনেক। তাই উদয়নের দোতলার ঘরে, গুরুদেবকে এনে ঘর বদলানো হয়েছে। উপরের ঘরে এসে গুরুদেব বেশ খুশিতে আছেন। জানালার কাছে বসে বাইরের দৃশ্য দেখেন। আজও তাই সকালবেলা গুরুদেবকে পশ্চিমদিকের জানালার ধারে কৌচে বসিয়ে দিলুম। সেখান থেকে বাইরেটা অনেকদূর অবধি দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন :

ভালো লাগে এই স্বাভাবিক সুন্দরদৃশ্য। এতে কোনো লজ্জা অপমান নেই। প্রকৃতির সঙ্গে এই সহজ সম্বন্ধ বড়ো মধুর। সাঁওতাল মেয়েরা বসে গেল গাছের নিচে ফল কুড়িয়ে খেতে গাছের ছায়ার আতিথ্যে। বনের মেয়ে ওরা, গাছপালার সঙ্গে এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা —এতে তো কোনো নিন্দে নেই। গাছের ফল ওরাই তো খাবে; ও-তো ওদেরই ফল। রথীকে বলব কিছু মহুয়া গাছ লাগিয়ে দিতে, সাঁওতাল মেয়েরা খাবে— যখন ফল ধরবে।

... ...

উদীচীর পাশে বাগানে বহুদিন আগে গুরুদেব নিজে শখ করে

বকুল গাছ লাগিয়েছিলেন। এতদিনে সে-গাছে ফুল ফুটেছে। সকালে সেই ফুল কিছু কুড়িয়ে এনে গুরুদেবকে দিলুম। কী খুশী যে হলেন, বললেন :

আমার উদীচীর বকুল গাছে ফুল ফুটেছে? আমি কি আর দেখতে পাব না। কতকাল অপেক্ষা করেছি, এতদিনে সেই ফুল ফুটল। আর কি আমি আমার 'শ্যামলী'তে যেতে পারব না—দেখব না আর চারিদিক?

... ...

'কোণার্কে' যখন গুরুদেব থাকতেন বাড়ির সামনে একদিন দেখা গেল একটি শিমুলচারা উঠেছে। বাড়ির এত কাছে এত বড়ো গাছের চারা রাখা নিরাপদ নয়। একদিন যখন এই চারাগাছটি সত্যিকারের গাছে পরিণত হবে, তখনকার বিপদের আশঙ্কা করে গাছটি কেটে ফেলাই অনেকে সংগত মনে করলেন। কিন্তু গাছটির প্রতি গুরুদেবের অসীম স্নেহে তা আর হয়ে ওঠেনি। দারুণ গ্রীষ্মে যখন সব গাছপালা ঝলসে যেত, গুরুদেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই শিমুল গাছে জল ঢালাতেন, তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য গাছের উপরে বাঁশ খড় দিয়ে চালা বেঁধে দেওয়াতেন। সেই গাছ বড়ো হোলো—একদিন বর্ষার শেষে দেখা গেল গাছে একটি মালতী লতা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে। গুরুদেব দেখে খুশী হয়ে উঠলেন। তারপর শীতে যখন সেই শিমুলগাছ ফুলে ভরে উঠত—বর্ষার মালতী শিমুলগাছের তলা সাদা ফুলে ছেয়ে ফেলত—তখন গুরুদেবের আনন্দের আর সীমা থাকত না। প্রতি বছর শীতে বর্ষায় শিমুল মালতীর এই পরিণয় তাঁকে যে কী মুগ্ধ করত। সেই শিমুল আছে কোণার্কের ছাদ ছাড়িয়ে আর মালতী শিমুলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।

তোর আঙিনায় মালতী ফুটতে শুরু করেছে?

এ দুটি ফুল—শিমুল আর মালতী—দু-সময়ের জিনিস। মালতী হোলো বর্ষার আর শিমুল হোলো শীতের। এরা বছরে দুবার তোর দুয়ারে অতিথি হয়ে এসে হানা দেয়। শিমুলকে মালতী কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে; এখনো শিমুল হার মানেনি; কিন্তু শিগগিরই ওকে মালতী চেপে মারবে। একদিন মালতীরই জয় হবে। অথচ ও-ই একদিন শিমুলকে আশ্রয় করে উঠেছে। মানুষের জীবনেও এমন কত দেখা যায়।

... ...

১৩ই জুন, ১৯৪১

এই মাটির ঘড়াগুলো কী সুন্দর। তা ঠিক সুন্দর জিনিসের রূপের গৌরব আছে, ধনের গৌরবের দরকার হয় না, সব সময়ে।

... ...

একদিকে যখন বর্ষা উপভোগ করবার সময় এসেছে, আর-একদিকে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে—জলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিধির এ কী বিড়ম্বনা দেখ্ দেখি। তাঁকে দয়াময় সময়ে বলা বৃথা।

... .

১৪ই জুন, ১৯৪১

এমন কত কাজ আছে যা ভাবতে বা দেখতে এখন আমার লজ্জা হয়। কে জানত যে, আমার বাল্যলীলাগুলি এমন ভাবে রক্ষিত হবে? বড়ো হওয়ার এই বিপদ; খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনা জমতে থাকে।

... ...

সংসারে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কে বাঁচবে কে মরবে সর্বদাই এই ভয় হয়। সবাই কি আর এই আমার মতো আঁকড়ে ধরে আছে—মরতে জানিনে।

'আরো' কথাটা মানুষের জীবনে মস্ত কথা। এই আরো চাই, এই চাওয়ার আর শেষ নেই। আমাদের ভারতবর্ষে আমরা ঐতেই মরেছি। এই 'আরো চাই' —এই চাওয়াটা কী করে চাইতে হয়, তা জানিনে কিন্তু। যা পাই তাই আঁকড়ে ধরে বসে থাকি।

... ...

২৯শে জুন, ১৯৪১

অবনীন্দ্রনাথের সেকালের সব গল্প সম্বন্ধে গুরুদেব বললেন :

আশ্চর্য রূপ দিয়েছে, ছবির পরে ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। সে একটা যুগ—রবিকাকা তার মধ্যে ভাসমান। আর জড়িয়ে নিয়েছে ওদের সবাইকে। কী সজীব—সব যেন আবর্তিত হচ্ছে। এমন ভাবে সেই যুগকে ধরছে এনে—ও আর কেউ পারবে না। তখন বেঁচে ছিলুম, আর এখন আধমরা হয়ে ঘাটে এসে পৌঁছেছি।

... ...

গুরুদেবের অপারেশন অনিবার্য—এ সম্বন্ধে কানাঘুষা চলছিল। উনি নিজে এ পছন্দ করেন না, অথচ জোর করে 'না'ও বলতে পছন্দ করেন না—কারণ কিসে যে ভালো হবে সে সম্বন্ধে কেউই নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারে না।—

আজকাল তো সব 'সায়েন্স' বের হয়ে মুশকিল হয়েছে। আগের কালে রোগে কী হোত। তারা তো

কথায় কথায় রোগীকে ছিন্নভিন্ন করত না। আমাকে ছিন্নভিন্ন করবার আগে একবার হোমিওপ্যাথী বা কবিরাজী চিকিৎসা করিয়ে দেখা ভালো। আমি রোগকে ভয় করিনে, ভয় করি চিকিৎসককে।

৩০শে জুন, ১৯৪১

কত অনাদরে মানুষ হয়েছি, কেউ দেখত না আমাদের। ভালোই এক হিসাবে। সবপ্রথম বড়দি— তারপরেই নতুন বোঠান আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেই প্রথম আমি যেন জীবনে আদরযত্ন পেলুম। এত দুর্মূল্য সেটা লেগেছিল তা বলতে পারিনে। এত ভালোবাসা তাঁরা দিয়েছিলেন—এত প্রচুর পরিমাণে। এক হিসাবে আমাকে মাটি করেছেন; পড়াশুনা করতুম না, দেখ্‌ না, চিরকাল কেমন তাই মুখ্যু হয়েই রইলুম। মনে পড়ে নতুন বোঠান দুপুরবেলা বালিশে চুল এলিয়ে দিয়ে 'গঙ্গামায়ের পরাজয়' পড়তেন—মাঝে মাঝে আমিও পাশে বসে পড়ে শোনাতুম তাঁকে। কোথায় গেল সে-সব দিন।

মাকে আমরা বেশি পাইনি। আমার বড়দিই আমাকে মানুষ করেছেন। তিনি আমাকে খুব ভালো-বাসতেন। মার ঝোঁক ছিল জ্যোতিদা আর বড়দার উপরেই। আমি ছিলাম তাঁর কালো ছেলে। বড়দি কিন্তু বলতেন—যা-ই বলো, রবির মতো কেউ না। বড়দির পর আমাকে হাতে নিলেন নতুন বোঠান।

মেয়েরা যে কত স্নেহ ঢেলে দিতে পারে সেই দেখলুম

যখন নতুন বোঠান আমাকে হাতে নিলেন। আমি তো বাড়ির কালো ছেলে, সেই কালো ছেলেকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন. এখন তা বুঝতে পারি। স্কুল থেকে ফিরে আসতুম, ঘরের দরজার পাশে চটিজুতোজোড়া,—বুঝতুম তিনি রেখে দিয়ে গেছেন যত্ন করে। কত রকম রান্না করে এনে আমাকে খাওয়াতেন। একদিন কী হয়েছিল—অভিমান হয়েছিল আমার, আমি কোথায় দৌড় দিলুম। খুঁজেপেতে এনে আদর করে অভিমান ভাঙালেন। কত আদর। তাঁর মধ্যে যেন গভীর ভালোবাসার একটা উৎস ছিল। অথচ আমার কিছু প্রশংসা করা সেটা যেন ঠিক গোছের নয় হয়ে উঠল। আমার কাব্য—তার চেয়ে বেহারী চক্রবর্তীর কাব্য ভালো। আমার গলা—তার চেয়ে সোমদা'র গলা—সে তো অনেক ভালো ;—শোনো কথা একবার। আর দেখতে আমাকে—এমনই বা কী। বড়ো দুঃখ হোত, আয়নার সামনে গিয়ে ভাবতুম কোন্‌খানে সংশোধন করলে ভালো হয়।

ঝগড়া নিয়তই হোত, চাবি চুরি করা আমার রোগ ছিল। যখন পেরে উঠতুম না চাবিচুরি করতুম তাঁর। সমস্ত তেতলার ছাদে খোঁজ চলত—কোথায় চাবি, কোথায় চাবি। সেই তেতলার ছাদটা যেমন ভালো লাগত, এমন বড়ো তেতলার লাগত না। সেটা তো অন্তঃপুরের তেতলার ছাদ। ঐ একটা সিঁড়ি, একটা ঘর, বেশি তো ভড়ং ছিল না। একটা কাঠের ঘর ছিল, সেইখানেই তরকারি বানানো হোত—আর-একখানি ঘর

সেখানাই তাঁর বসবার, শোবার। সেই ছাদখানিই আমার খুব প্রিয় ছিল আর কি। সে-রকম তেতলার ছাদ আর হবে না, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দেখতুম, আকাশে মেঘ করে আসত, আমার চিরকালের আনন্দ। এক-একদিন আবার পুতুলের বিয়েতে ভোজ হোত। সে রীতিমতো খাওয়ানো। নতুন বোঠান বলতেন—রবি ঠিক ওনার মতো করে খায়। তা খাব না তো কী বল্। কী রকম ছেলেমানুষ ছিলুম তোরা বুঝতেই পারবি না। এখনকার কালের সঙ্গে কত তফাত।

১লা জুলাই, ১৯৪১

জানলার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে বললেন:

এই ছেলেমেয়েরা জড়িয়ে আছে প্রকৃতিতে। ফল দিচ্ছে, ফুল দিচ্ছে, তাই সংগ্রহ করছে, কী সুন্দর জীবন। এর মাঝে এল হিংসা। এ ওকে হিংসা করবে, মারবে। এর কী দরকার ছিল। এই হিংসা, ভয়, এসেই দিল সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে। কী করে যে এল এটা—এ একটা খেলা, একটা এক্সপেরিমেণ্ট, জীব জীবকে নষ্ট করে চলবে। এই এক্সপেরিমেণ্ট করছে যারা, আজ তারা মার খাচ্ছে। Beef খাবে, Bacon খাবে—আমরাও তা এতদিন টেবিলে খেয়ে এসেছি। ভালোও লাগত। কিন্তু কেন এই সব। বেশ তো ছিল, গাছ থেকে ফল পাড়া হোত; বড়ো জোর কিছু চাষ। তা নয়—বাঘ হরিণকে তাড়া করল, হরিণ প্রাণভয়ে ছুটে পালাল আত্মরক্ষা করবার জন্যে। এই যে হিটলারী যুগ, এর কী দরকার ছিল। এই রক্তের

স্রোত বইয়ে দেবার? এর শেষ হচ্ছে—মৃত্যু। কত সুন্দর এই ফুল, এই গাছ। আজ এল একটা savage মনোবৃত্তি। এ ওর ভয়ে অস্থির—

মানুষ যখন জন্মায় তখন তো এইসব নিয়ে জন্মায় না। কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল, কত সুন্দর প্রণালী। তা নয়, মারামারি, টানাটানি, ছেঁড়াছেঁড়ি করাই যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তবে সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো মৃত্যু নয়। আমাদের দেখতে হবে কোথায় সৃষ্টির তাৎপর্য।

… … …

দুপুর

নিজের রোগনিরাময় সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন গুরুদেব আজকাল।—

শনি যদি একটা কিছু ছিদ্র খোঁজে, সে যদি আমার মধ্যে রন্ধ্র পেয়েই থাকে, তাকে স্বীকার করে নাও। মিথ্যে তার সঙ্গে যুঝে লাভ কী। মানুষকে তো মরতে হবেই একদিন। তা একভাবে না একভাবে এই শরীরের শেষ হোতে হবে তো। কবিরাজ তো অনেক আশ্বাস দিয়ে গেলেন। বিশ্বাসযোগ্য নয়—তবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

২রা জুলাই, ১৯৪১ সকাল

রাত্রিটা অসম্পূর্ণ সৃষ্টি টের পাওয়া যায়। যে-সময়ে গাছপালা ডালগুলোকে পায়নি, পাখি তার পালক পায় নি; সেগুলো হচ্ছে দুঃস্বপ্ন বিধাতার। এই যে একটা

বেদনা—যে, হোতে চাচ্ছে অথচ পারছে না—এই বেদনা ক্লিষ্ট করে আছে সমস্ত আকাশ।

এই একটা বর্বরতা আছে, সৃষ্টির আরম্ভে, যখন অসভ্যরা তাণ্ডব নৃত্য করেছে, তারা সব নাক ফুঁড়ে এটা-ওটা ক'রে নিজেদের কুৎসিত করেছে; এইটে ব্যঙ্গ করেছে নির্বুদ্ধিতা। সৃষ্টির যে চেষ্টাটা সেটাতে যত দুঃখ যত বেদনা, সেই হচ্ছে দুঃস্বপ্ন। সেই রাত্রি যেন শেষ হোতে চাচ্ছে না। খুব যে সুন্দর কিছু তা নয়। কালকের যা বলেছিলুম তা ছিল অন্য রকমের খেয়াল। অর্থাৎ সৃষ্টি যখন সম্পূর্ণ হচ্ছে না, তখনকার ভয়ংকর ব্যথা, কেবল কাটাকুটি কুৎসিত আবর্জনা। কত যুগ-যুগান্তর কেটে গেছে ভেবে দেখ্। ক্রমে ক্রমে সেটা গিয়েছিল, আবার এসে দেখা দিল। ভিতরে লুকিয়ে ছিল অসমাপ্ত কীর্তি, আবার এসে দেখা দিল।

... ...

একটা ছবি আঁকিস তো—অসম্পূর্ণ কদাকার জলহস্তী-সব—এখনো সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি—তারা সব দেখা দিচ্ছে অন্ধকারের ভিতর থেকে।

৩রা জুলাই, ১৯৪১

আমার কথা শুনে এখনো তোরা বুঝতে পারছিস কিন্তু আর দু-দিন বাদে তা হয়ে উঠবে প্রলাপ বকুনি; শিশুমুখের প্রলাপ। এখনই আমি এক এক সময়ে খুব সহজ কথাও ভেবে মনে আনতে পারিনে।

আমার পিতার কাছে ছিলেন প্রিয়নাথশাস্ত্রী মশায়।

উনি যখন বলতেন হাফিজের অমুক জায়গাটা মনে পড়ছে না, পড়ে শোনাও, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী পড়ে শোনাতেন। আমারও একজন সেই রকম দরকার হবে শিগ্‌গিরই। একজন বাক্যবাগীশ চাই পাশে আমার দেখছি।

কী করে কয়েকটা টাকা গুরুদেবের পকেটে স্থান পায়—অবাশ্য ক্ষণকালের জন্যই। তাই নেড়ে নেড়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে খুব গম্ভীর ভাবে গুরুদেব বললেন :

লিখিস আমার জীবনচরিতে যে, একসময়ে ওঁর ধনগর্ব খুব বেড়ে গিয়েছিল। পকেট ঝন্‌ঝন্ করত, কিন্তু কেউ জানত না উনি পাঁচটাকার ধনী। কবি কি না, অল্পকে বৃহতে পরিণত করতে পারতেন। যাঁরা পাঁচটাকার ধ্বনিকে পাঁচহাজার টাকার ধ্বনিতে পরিণত করতে পারেন, তাঁরাই শ্রেষ্ঠধনী।

... ...

মেয়েদের ঘরকন্না করতে হয়, ভবিষ্যত ভাবতে হয়। মেয়েরা মিতব্যয়ী হবে এটা একটা গুণের মধ্যে। এ'কে কৃপণতা বলে না।

... ...

আমার ভারি মজা আছে ; সংস্কৃত বেশি কিছু জানিনে ; দু-চারটে চন্দ্রবিন্দু বিসর্গ লাগিয়ে বলতে পারি। লোকে বলে বাপ রে কী পাণ্ডিত্য। লোকে আমাকে ধরতে পারে না। কেউ বুঝতে পারে না—লোকটা অশিক্ষিত। দিলুম একটা শ্লোক ঝেড়ে—তারপরে মাথা ঘামাও তোমরা। এখান থেকে ওখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে কাজ চালিয়ে

দিয়েছি। সত্যি সত্যি এ আমি ঠাট্টা করছিনে, এ'কে বলে উঞ্ছবৃত্তি। অর্থাৎ যেটুকু আমার প্রয়োজন, বাছাই করে নিয়েছি। এইটে আমার গুণ, সবাই বুঝতে পারে না। এটা কিন্তু খুব অত্যুক্তি করছিনে। পড়াশুনাও ছেলেবেলা থেকে—থাক্ সে কথা; কী করে আর বলি ইংরেজি শিখেছি; ব্যাকরণের ব্যা-ও বুঝিনে, কিন্তু মনে হয় ইংরেজি ভাষাটা চালিয়ে নিতে পারি একরকম করে। ভাষার ব্যবহারটা একটা instinct থেকে চালিয়ে নেওয়া যায়। এটা খুবই সত্যি। যাবার আগে ঝুলি ঝেড়ে সব দেখিয়ে যাব—আমার কিছু নেই—কিছু ছিল না, সব ভেলকি বাজি খেলিয়ে গেছি। নিজে যা করবার করেছি, রচনা করে গেছি। অনেকদিন অবধি আমার জানা লোকেরা ভাবতেই পারেনি যে, আমি ইংরেজি জানি। তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল যখন আমি ইংরেজি ভাষাতে নাম কিনলুম। সেটা একটা miracle হোলো। তাই দেখেছি, ভাষা কী রকম করে উদ্ভব হয় মনের ভিতরে। অনেক শিখেও অনেকের হয় না, আবার অল্প শিখেও অনেকে কাজ চালিয়ে দেয়। আমার বেলাও হয়েছিল তাই।

... ...

এত আবর্জনা সইবে কে। এই যে আমাদের যুগের সাহিত্য এল—এ যে কিছু খুঁজে পাবার জো নেই।

একসময়ে cubism এসেছিল—হুস করে চলে গেল। কারণ এ মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। মানুষ সৌন্দর্যের

পক্ষপাতী। মানুষের স্বভাবের উপরেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা রাখতে হয়।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪১

কয়দিন থেকে সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কাল গুরুদেব বলছিলেন আজ বর্ষা সম্বন্ধে ছোটো একটা লেখা লেখাবেন। সকালে গুরুদেবকে জানালার ধারে কৌচে বসিয়ে দিলুম। আজও তেমনি বৃষ্টি পড়ছে—উত্তুরে হাওয়ায় সেই বৃষ্টির ছাঁট ঘরের ভিতরে গুরুদেবের গায়ে লাগছে। কাঁচের জানালাটা বন্ধ-করে দিলুম। কালকে যে বলেছিলেন বর্ষা সম্বন্ধে লেখাবেন সে-বিষয়ে ওঁকে বলব ভাবলুম, কিন্তু আজ দেখি, তাঁর মন যেন এ জগতে নেই—দূরের পানে তাকিয়ে আছেন—মন যে কোথায় চলে গেছে কে জানে। থুঁতির নিচে হাত দুখানি রেখে স্থির হয়ে বসে আছেন। কিছু আর বললুম না—নিঃশব্দে পাশে বসে রইলুম। খানিকবাদে গুরুদেব অতি ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের মতো আপনমনে বলে যেতে লাগলেন :

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি—কী রকম যেন লোকজন নেই কোথাও, আমাকে সৃষ্টি করতে করতে রূপকার অসমাপ্ত রেখে চলে গেছে—মনটা তাই বাকী অংশের জন্য ধড়ফড় করছে। ভারি অদ্ভুত আমাদের মনের গতি।

জীবনের একটা নিভৃত জায়গা আছে যেখানে জীবনের সমস্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধগুলো ফেনিল হয়ে ওঠে, যেখানে শুধু শুশ্রূষা নয়, শুশ্রূষার চেয়ে মন বেশি করে চায়—সান্ত্বনা। এটা বাল্যকালের একটা আকাঙ্ক্ষা, মেয়েদের আঁকড়ে ধরবার বন্ধন—শেষ অবস্থায়ও যেন প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন পীড়িত হই তখন মনে হয়—মেয়েরা কাছে থাকলে ভালো হয়। ও যেন নাড়ীর বন্ধন। কেন,

পুরুষরাও তো খুব সেবা করতে পারে। আমি বলি তাতে চলে না তো কী। ভালোই চলে জানি। তবুও—কী হবে আর বলে। এ একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস, যতই বয়স বাড়ে বাল্যকাল ফিরে আসে। অনেকগুলো অভিজ্ঞতা যার ভিতর দিয়ে মানুষকে যেতে হয়। আশি বছর না হোলে এ অভিজ্ঞতা হোত না বোধ হয়। যাই হোক—এ সবই হচ্ছে যাকে বলে জীবলীলা। জীবলীলার শেষ দিক হচ্ছে যেটা দৈহিক, কারণ দেহ তখন অক্ষম হয়। সে-অবস্থায় দেহ তখন যা চায় সেটা তত্ত্বকথা নয়। রক্ত-স্রোতে বহমান সেটা। এটা একটা সত্যিকার এক্স-পিরিয়েন্স, প্রাণের প্রেরণা। তর্কের বিষয় নয়, শিক্ষার বিষয় নয়, পাণ্ডিত্যের বিষয় নয়, তাদের অনেক প্রয়োজন আছে কিন্তু এটা আর-একটা কিছু। মনের ভিতরে এই সন্ধান এটা কেমন করে যে এসে পড়েছে তা বলতে পারিনে। আর কিছুকাল পূর্বে আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত দৃঢ় ছিলুম। কখন এক সময়ে সেটা শিথিল হয়ে যেন জীবনের ভাষার পরিবর্তন হয়ে গেল। নিতান্ত হাল্‌কা হয়ে গেল তার 'ইডিয়ম'। তার ভাব-ভঙ্গীটা হয়ে এল ঘরোয়া রকমের। কেউ কেউ বলে থাকেন আমার এখনকার সাহিত্যিক ভাষা হয়ে এসেছে নতুন রকমের। এটুকু জানি যে, ইচ্ছে করে হয়নি। এখন কী হয়েছে তাও অন্যরা বলবার আগে নিজে উপলব্ধি করিনি। এক সময়ে ভাষা যাদের সঙ্গে কথা কইতে চায় আগে তারা যেন

তার সভার বাইরে ছিল। তাদের চোখেই পড়ত না। তাদের সঙ্গে তার আলাপ জমত না। এখন তার আলাপের সঙ্গীরা চারদিক থেকে এত সহজে তার আসরে ঢুকে পড়ে যে, তা জানতেই পারা যায় না। সভার রূপ বদল করে দেয়। যাঁরা বলেন ভাষায় একটা নতুনত্ব এসেছে তাঁরা হয়তো জানেন না যে, নতুন আলাপীর দল জুটে গিয়েছে। আগে তারা প্রবেশ পায়নি কেননা তাদের বেশভূষা চালচলন ছিল অন্য শ্রেণীর।

অন্যরা যখন বলে যে, আমি এখন ভাষাতে অপরূপ কিছু এনেছি—আমি বুঝতে পারিনে, যে, তা একটা নতুন সৃষ্টি। বেশি সহজে যারা নেয় তারা তা অনেকেই বুঝতে পারে না। সহজে নেয় সবাই কিন্তু তার ভিতরে যে কতখানি কারুকার্য—একটার জায়গায় আর-একটা বসানো—তা বুঝতে পারে না তারা।

ভাষাটা এক রকম করে চলছিল ভারি ভদ্র রকমে, জলদ্-গম্ভীর স্বরে, হঠাৎ সে বললে—ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কথা কও। সহসা সেটা কখন কানে এল। কী করে কী হোলো বুঝতে সময় দেয় না। যেমন আমার ছবি আঁকা। আমি তার হঠাৎ আনাগোনা বুঝতেই পারিনে। লোকে যখন আদর করে—আমার অবাক লাগে।

লিখতে আরম্ভ করেছিলুম একটা প্রচলিত পন্থা দিয়ে। ভিতরে ভিতরে একটা শিক্ষা জমে উঠেছিল কী করে লিখতে হয়। সেই ভাষাই সবাই গ্রহণ করেছে। সেই

ভাষার ভিতরে অলংকার দিয়েছি, নতুন রস দিয়েছি—বাইরে থেকে ভালো রকম করে সাজিয়েছি, লোকে বলেছে—বাহবা। কিন্তু এখন এল আর-একটা সহজ ভাষা, লোকে বলে এটা তো চিনিনে। কতদিনের একটা স্মৃতি—প্রাচীন তরঙ্গভঙ্গ। ঢের লেখাতে নতুন নতুন পন্থা দিয়েছি কিন্তু সেটা যে নতুন ও-কথা কেউ এসে বলেন নি। পুরাতন যিনি তিনি কখনো বা শাঁখা প'রে আসেন, কখনো বা দশটা পাঁচটা সোনার চুড়ি প'রে আসেন। এটাই চলে এসেছিল। রচনার সৃষ্টিকর্তার একটা ইতিহাস আছে—কতকাল তা বলে এসেছি, বঙ্গভঙ্গ এল—রবীন্দ্রনাথ ভেঁপু ধরলেন, সবাই বলে এ আর কেউ পারে না। আবার যাঁরা নিন্দুক তাঁরা নিন্দে করেছেন। হঠাৎ এবারে সবাই বলে—আশ্চর্য, একেবারে নতুন জিনিস দিয়েছি। আমি তা জানিনে সহজ ভাবে লিখে গেছি, একটু রস দিয়েছি। আগের ভাষাতেও দেওয়া চলত। তারা সব পুরানো গৃহিণী—এ হচ্ছে নবীনা। বুঝতে পারা যায় না যতক্ষণ না পাশের লোকে বলে। এক-একবার মনে হয় আবার ওটাকে জেনে-শুনে করা যায় কিনা। এখন একটা নতুন ভাষা এসে পড়েছে আমার কলমের মুখে। এই আদর্শ রক্ষা করা যায় কিনা এ ভাবলেই আর-এক নতুন ভদ্রলোক এসে পড়বে। আমি অবশ্য ভাবিনি। জানি শেষ পর্যন্ত হবে না, হয়তো বা আর-একটা কোনো বাঁক ফিরবে—সে কী তা আমি জানিনে। আস্তে আস্তে পরিবর্তন যেমন

নদীর হয়—সেই রকম হোলো। আস্তে আস্তে প্রকাশের ধারা সময় বুঝে নতুন একটা শক্তি হাতে এনে দেয়—দিয়েছে, বরাবর দিয়েছে। অনেক দিকে কাজ করেছি, কবিতার এমব্রয়ডারি অনেক দিন করেছি, এখন তাই চোখ বুজে হয়। দিয়েছি—আশীর্বাদ, দু-তিন লাইনের কবিতা, আরো কতকিছু চোখ বুজে যা দিয়েছি—সবাই বলে, ও আর কারো হাত দিয়ে বের হয় না। বরাবর সেই সূচ সেই সুতো দিয়ে কাজ করে এসেছি। তাই যদি কেউ বলে—এই বিষয় চাই,—লিখে দিই, হয়ে যায়। বেশ ভালো করেই হয়, তারপরেকার যেটা, সেটা বরাবর নয়।

এমন সময়ে এখানকার একজন গানের শিক্ষক এসে তাঁকে প্রণাম করে দু'চার কথা বললেন। গুরুদেব সেই ভাবেই বসে আছেন—সেই রকম দূরের পানে তাকিয়ে। মাঝে মাঝে হঁ্যা না করছিলেন শুধু। তাঁর কানে সব কথা পৌঁছল কিনা কে জানে। শিক্ষকমশায় তাঁকে অন্যমনস্ক দেখে একটু বাদে প্রণাম করে উঠে গেলেন। গুরুদেব পূর্বেকার কথার সুর টেনে বলে যেতে লাগলেন :

এই আমাকে অবলম্বন করে সৃষ্টিকর্তা আর-একটা সুরের শিল্প দিয়ে আর-একটা কাণ্ড করালেন কেন। এ আর এক ধারা চলেছে, ঠিক বুঝতে পারিনে হচ্ছে কী না হচ্ছে; সুরের প্রবাহ চলেছে। ঠিক তেমন করে ছবি হবে না। ছবি বড্ড নতুন, বড্ড অল্পকাল হোলো এসেছে এখনো ধরা দেয়নি; এখনো ওকে চিনতে পারিনি। অর্থাৎ ও যা-তা করে বেড়াচ্ছে। আঁচড়-মাঁচড় কাটি।

তার মানে আমার দৈবক্রমে সাহিত্য এবং সংগীত এক ধারায় চলেছে। আমার গান যারা ভালোবাসে ওর যেটা লিরিকাল রস সেটাকেও গ্রহণ করে। কথায় যা বলেছি, সুরে সেটা কম্বিনেশন করে। এটা আমাদের মধ্যেই হয়েছে। এটার একটা ট্রাডিশন আছে। বাংলা দেশ সংগীতে সাহিত্যকে ছাড়েনি—গান ভালো হোক মন্দ হোক কথার মানেটা রক্ষা করেছে—অন্য দেশে তা করেনি। বাংলায় সাহিত্য সংগীত একত্র হয়েছে। হিন্দুস্থানী সংগীতে এটা দৈবাৎ পাওয়া যায়। একটা কম্বিনেশন হয়ে গেছে আমার জীবনের মধ্যে—তা সত্যি। নানা ধারা তার নানা কন্ট্রিবিউশন নিয়ে এসেছে। আমি খাতির করিনি কিন্তু আপনা-আপনি তারা মূল্য জানিয়েছে। দেশের লোকেরা মূল্য দিতে দেরি করেছে। কিন্তু শেষটায় হার মেনেছে। কোথায় ছিলেম পদ্মার তীরে তীরে—নদীর স্রোতে—বাংলাদেশের নানা নদী, নানা স্রোতের মধ্য দিয়ে। তুষ ঝাড়ছে, ধান ভানছে, গোরু বাঁধা আছে গোয়ালে। নদীর জল তাদের কোলে এসে পড়েছে, পাশ দিয়ে যাচ্ছি বিচিত্র কাজের কোলাহল দেখছি—বেশ ছিলুম আমি। কী দরকার ছিল বিশ্বকবি হবার। জগতজোড়া এই নাম বহন করবে কে। অল্প পরিধির মধ্যে কী সহজ ছিল সেই জীবন-যাত্রা। প্রজারা আসত নালিশ করতে কেউ ঠকালে। আমার কাছে গোমস্তাদের ফাঁকি ধরা পড়ত, তাদের ছাড়িয়ে দিতুম। একমাত্র বন্ধু ছিলুম প্রজাদের।

ওদিকে উঠছে হাঁসের কাকলী ক্যাঁ—ও, ক্যাঁ—ও দিন-রাত্রি। আর সে কী দিন—সোনায় মণ্ডিত। দরকার কী ছিল খ্যাতির। সেখানে থেকে সরে এসে কী পেলুম। আসল জীবনের আনন্দ—সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে একতান স্বরে গান গেয়ে উঠেছিল। সেই জীবনের ধারা কবে ফিরে পাব। আমার পদ্মা অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়েছে—সেই বিস্তীর্ণ চর এখনো পড়ে আছে। এই তো সময় হয়েছে, জল নেমে গেছে, জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু জল জমে আছে, কচি কচি ঘাস উঠেছে ধারে ধারে। জ্যোৎস্নায় বেড়াই ঘুরে ঘুরে, চরে কতদূরে হঠাৎ সেই ঘাট চলে গেছে আর দেখা যায় না, ভয় হয় বুঝি বা পথ হারিয়েছি। ফিরলুম বোটের দিকে, রাত্তিরে বোটের ছাদে ঘুমোতুম, আকাশের তারা জ্বলজ্বল করছে। সকালে দেখি শুকতারা উঠেছে। ফটিক ডালের সুপ এনে দিলে, সেই ছিল সকাল বেলার পথ্য। কিছু খেয়ে কোমর বেঁধে লিখতে বসতুম। এর মধ্যে মধ্যে বলুর* তাগিদ আসত গল্প চাই, দিতুম লিখে। মৃন্ময়ী গল্পটি—ছাঁটা চুলের অদ্ভুত মেয়ে কত সহজে লিখেছি। সেই চরের মধ্যে সেই বিস্তীর্ণ আকাশের মধ্যে, জলস্রোতের মধ্যে বসে আছি। গল্প লেখো, এইটুকু—বেশি না। লোকে কতটুকু এর দাম দিয়েছে। এই নিয়ে আবার সময়ে সময়ে খোঁচা দিয়েছে—ঐ টুকুর মধ্যেই—বেশি কিছু না—ঐটুকু যা ওঁদের পাতে দিয়েছিলুম ঐটুকুর মধ্যেই সব পেয়েছি।

*স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজকের এই বোঝা বহন করা—এই কি ভালো, এই জগতজোড়া নাম। তাই ভাবি, আচ্ছা আমাকে ছেড়ে দিল না কেন—সেই পতিসরে—ছোটো নদী' শ্যাওলা জমেছে, তাতে জড়ো হয়েছে বক, সাদা সাদা শাপলা ফুটেছে, নদীর স্রোত মৃদুমৃদু বইছে, জেলেরা মাছ ধরছে, মাথার উপরে শঙ্খ চিল উড়ছে, দস্যুতা করবে; দিন কাটত এই সব দেখতে দেখতে। তাতেই বা দোষ কী। তারপরে কিছু খাবার খাওয়া গেল—মাছ মাংস খেতুম না তখন—রুচি ছিল না। ঘুম নেই—দেখছি বোটের তলায় স্রোত উঠছে নামছে, ধক ধক করছে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আর দিনের যেটা রূপ—জেলে ডিঙি সাদা, পিঙ্গলবর্ণ পাল উড়িয়ে চলেছে মাছ ধরতে ধরতে। এই ঢের, কী ক্ষতি।

জীবনের আনন্দ—ছোটো আয়তনের মধ্যে তার সব আবেদন প্রকাশ পায়, তার দাবি বেশি থাকে না। আসে চাষীগুলো নালিশ জানাতে, তারা সুবিচার পায় আমার কাছে। মানুষের কাছে এই পর্যন্ত বিষয়কর্মের জগত। ওপার থেকে গোরুর গলা ধরে চাষীর ছেলে ভাসতে ভাসতে আসছে। এপারে ধান পেকেছে—চাষী নিড়োতে এসেছে হৈ হৈ করতে করতে। সেই তাদের অল্প মূল্যের জীবনের সঙ্গে অল্প মূল্যের রবীন্দ্রনাথ মিশে গিয়েছিল। কখনো মনে হয়নি আমি কেন জগৎবিখ্যাত হব না। লিখছি একটু-আধটু—'মানসসুন্দরী'। দিনের আলো আস্তে আস্তে নিভে এল, ছায়া পড়ে এল চারিদিকে।

ওপারে কাছারি ভাঙত, আমি তখন ডিঙিনৌকো ভাসিয়ে দিতুম। দূর থেকে দেখতুম আমার বোট, উপরে সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে, ভিতরে একটি দীপ। কত ভালো লাগত ভাবতে, ঐখানে আমার রাত্রি যাপন হবে। ছাদের উপরে বড়ো চৌকি পাতা থাকত— দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়তুম। হঠাৎ জেগে দেখি রাত দুটো, উঠে ভিতরে যেতুম। এই তো দিন। এুকে কি কেউ নোবেল প্রাইজ দিয়ে কেনে। মানুষের অন্তরের আনন্দ মূল্য দিয়ে কি কেনা যায়। এতে তো জীবনের আনন্দ বাদ পড়েনি। একথা তখন কারো মুখ দিয়ে বের হোতে পারত না যে. রবি ঠাকুরের লেখা জগতে কেউ বড়ো দাম দেবে। কারো কারো যে ভালো লাগেনি তা নয়, কেউ কেউ ভালোও বলত, অল্পের মধ্য দিয়ে হোত, নগদ বিদেয় করত। তার চেয়ে বেশি পাইনি। দিনের পর দিন গেছে কেটে। বর্ষা এল, আকাশে কালো মেঘ—নদীর জলের উপরে বৃষ্টির ধারাপতন— যেন একটা রংএর পাড় বুনে দিচ্ছে। হোতে হোতে এক-একদিন প্রবল গর্জন। বোট বাঁধো—বোট বাঁধো। প্রতিদিনের সব সামান্য ব্যাপার—তোমাদের থেকে বেশি কিছু না। তখন ছিল ঐটুকু—আমাদের রবি ঠাকুর— তা বেশ লেখে। ঐটুকুই। তা তোমরা ঐটুকুর উপর দিয়েই গেলে ভালো হোত কিন্তু যখন আবার গাল এসে পড়ত—মন যেত খারাপ হয়ে। কতবার ভেবেছি— লেখা বন্ধ করে দিই, যদি তোমাদের ভালো না লাগে

তবে কী গায়ে পড়ে লিখব, অভিমান হোত। যাদের সঙ্গে ঝগড়া করতুম, আজ তারা কোথায়। এইটুকুই ছিল তখন আমার জীবনের পরিধি।

একদিক থেকে এটা খুব সত্য, এই অল্পপরিসর জীবনের আনন্দ বিচিত্র হয়ে উঠেছে ফলে ফুলে, পাখি কুহরিত কলরবে ; এখন যখন ভাবি তার মধ্যে যে আনন্দ ছিল তার আর তুলনা নেই। এখন যদি কোনো দুশমন বলে যে—ওহে কবি, তোমাকে যা দাম দেওয়া হয়েছে তা তুমি দিয়ে দাও আর-কাউকে, রাজী আছ তাতে ? এখন এও এক ভাবনা—তাই বা ছাড়ে কে। এখন কী করা যায়। একদিক হচ্ছে এম্বিশনের দাম, আর-একদিক হচ্ছে সহজ সরল দাবি, যতটুকু পাওয়া যায়। তার মধ্যে নানা রকম দুঃখও ছিল। সেগুলো কী রকম করে সরে গিয়েছে দৃষ্টি থেকে। কেবল দেখছি দিনগুলো যাচ্ছে—রাখালী দিন, পালতোলা জেলেডিঙির দিন, এটা হোলো বিশুদ্ধ আনন্দের দিন। ওটা যদি পাশে না থাকে—দণ্ড হাতে নিয়ে শুধু মুকুট মাথায়—তবে বলব—সেই ছিল ভালো। মানুষ অদ্ভুত জীব—তার এদিক ওদিক দুদিক আছে, কোনোটাই ছাড়তে চায় না। তার আসন, তার দাম দিচ্ছে সকলে মিলে। বলবার শক্তি নেই যে, আমি চাইনে। এক-এক সময়ে বলতুম—কিন্তু তা বাজে কথা। এই রকম করে দু'দিকই আছে—কার দাম বেশি বলতে পারিনে। জনতার মাঝখানে জয়ন্তীর ভিড়ে, জয়ধ্বনির কলরবে দাঁড়িয়ে ভাবি—এখন তো আমি মুমূর্ষু হয়ে পড়ে

আছি, কী আর হবে। যৌবন যখন উদ্বেল ছিল তার পুরো দাম দিতে পারত, এখন কী হবে। এই তো শুয়ে আছি, দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি—জয়ন্তী! অর্থাৎ এতদিন পরে বাংলাদেশ বলছে—আমি যে আছি সেটার একটা মূল্য আছে; বাংলাদেশ আমাকে চাচ্ছে। আনন্দ কিছু পেয়ে থাকব সে-সময়ে কিন্তু সেটা আত্মবিস্মৃত নয়। সবাই যাচাই ক'রে, ওজন করে দিয়েছে—ভুলতে দেয়নি, বলে বলে দিয়েছে। জগতের ভিতর দিয়ে বড়ো রাস্তা দিয়ে চলে গেছি—ভালোবাসা কুড়িয়ে গেছি, ওমনি পাইনি। বিদেশের ভালোবাসা, অকারণ ভালোবাসা পেয়েছি! কী দেখে তা বুঝতে পারিনি। মানুষকে মানুষ যে কাছে টেনে খুশী হয়ে ওঠে—এটা উড়িয়ে দিতে পারে না। বড়ো দামই দিতে হয় কিন্তু তবু তার সঙ্গে এর তফাত আছে। কিছু কী পেয়েছি না পেয়েছি তার জন্য ভাবনা হয়নি। কিন্তু আজকের এটা বিস্ময়জনক। আমার কাছ থেকে যা পেয়েছে অনেক ফেলে দিয়েছে, অবজ্ঞা করেছে। তবু আজকের দিনে যারা লড়াই করছে ঐ বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া যখন গেছি সেখানে, রাস্তায় লোকে লোকারণ্য—আমাকে তারা দেখে চিনেছে। সেই যে কাছে টানা সেটা বড়ো আশ্চর্যজনক। সেইটা অনুভব করেছি বলেই বিশ্বভারতীর কথা ভেবেছি। মানুষ যে মানুষকে টানে সে কোথা থেকে—কীসে টানে। সেই আর্ক্‌ডিউক হেস্‌, ডাম্‌স্টাটের বাড়িতে যখন জটলা হোত তারা আসতো দূরের থেকে, বড়ো বড়ো সব

য়ুনিভারসিটির ছাত্ররা। আমাকে দেখে বললে—আজ আমরা বুঝতে পারছি—সেই গল্প, যারা বুড়োকে ধরতে গিয়ে ধরে ফেলেছে চির যুবাকে। আমরা আজ পেলুম তাই। সে কথা সত্যিই বলেছিল—তাদের মনেতে আশ্চর্য লাগল আমাকে কাছে পেয়ে। এ আর-এক রকমের আনন্দ—আর-এক জাতের মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের। আমি এতক্ষণ যা বললুম—তা জলের স্রোতের মতো ভেসে যাচ্ছে, কাগজের নৌকোর মতো, ছোটো ছোটো বাণী দিয়ে। সে আর-একটা আনন্দ। বৃহৎ মানবের হৃদয়ের যা যোগ তা এতে নেই। মানুষ বলতে যা বোঝায়, তা ছিল তখন চাষীরা, প্রজারা। এ হোলো প্রতিদিনের ছোটো জীবনযাত্রা—ঘটনাবলী, ছবি। এই দিয়েই তো চলে যেত দিন। আমি করতুম কী—বোটের মাথার উপরে খড় দিয়ে কুঁড়েঘর বানাতুম আর থেকে থেকে জল ঢালাতুম তার উপরে। তাতে বোটের মাথা থাকত ঠাণ্ডা হয়ে। তারপর যখন ব্যালির ঝড় উঠত —নাগিনীর মতো শা শা ক'রে, তখন তা নামায় কে। তারপর সন্ধে এসেছে, অন্ধকার মসৃণ হয়ে এসেছে—হাওয়া দিচ্ছে ঝিরঝির করে, সব দুঃখের অবসান। সেও গেল। তারপর এল বর্ষা, তারপর শরৎ সব দেখেছি পদ্মার বুকে বসে; সব ভেসে গেল পদ্মার জলের উপরে; —পদ্মা যে আমাকে বুকের ভিতর টেনে নেয়নি—আশ্চর্য। চেষ্টা করেছিল। আশ্চর্য জীবন, তারপরে এলো জনসমুদ্রের আহ্বান। প্রকৃতির প্রতিদিনের লীলা—তার রং খুব ভালো

লাগছিল। তাই বলি কাকে ত্যাগ করব। ছাড়তে পারা অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে ওটা। আমার জীবনের মিরাকেল হচ্ছে ওটা—সত্যিই আমি জীবনের অনেক কিছুই বুঝিনে। আমার নিজের রচনার ধারা অনেকই বুঝিনে। ইংরেজ আমাকে নেয়নি, নিজেদের সাহিত্যের সঙ্গে বিচার করেছে, মানুষটা কী রকম তা দেখেনি। আর তা ছাড়া দেখেছে আমি ব্রিটিশ সাবজেক্ট, তাতে গর্ব বোধ করেছে, সেটা অহংকার, তার কোনো মূল্য নেই। পরে দেখেছি তা নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। ইংরেজ আমাকে নেয়নি—এ কথা খুব সত্যি। ছোটো একটা অংশ নিয়ে থাকবে হয়তো, কোয়ালিফায়িড্ একটা সম্মান দিয়েছে।

৫ই জুলাই, ১৯৪১

ভোরবেলা বসে আছি সামনের বারান্দায়, সোনালী রোদ্দুর পড়েছে—চেয়ে চেয়ে দেখি, মনে হয় দূরের রাজ্য, ওরই মধ্যে আমি বাস করছি। দূরে 'খেলনা চাই', ফেরিওয়ালার ডাক—সব শুদ্ধ জড়িয়ে মনে হয় একটা আরব্য উপন্যাসের দেশ। এটা আজ নয়—ছেলেবেলা থেকে এ রকম। বসে থাকতুম—দূরের পাখি, চিল ডেকে যেত আকাশের গায়ে, দূর-বহুদূর। আর বহুদূরের মাঠ—তারা যেন আরব্য উপন্যাসের খেলনা বিক্রি করে। আচ্ছা, এ রকম কেন মনে হয়। তারপরে যখন কাছের লোকের দিকে চেয়ে দেখি—খটখটে মনে হয়, যখন আর-এক লোকেতে এসে পড়লুম। খুব শুকনো লাগে, মনে হয় এদের কণ্ঠে সেই দূরত্ব নেই। আমি এটা ভালো

করে বলতে পারিনি, লিখতে পারিনি যে আমি বাস করি দূরের মধ্যে। কাছাকাছি নিকটে আমি নেই। আমি যে সেই দূরের অন্তরে—বহুদূরের অভ্যন্তরে আছি—তা ভালো করে বলা হয়নি। ঐ কথাই বলতে গিয়েছিলুম তাদের—যারা বলে যে একটা ইতিহাসের ভিতর থেকে কবিতার উদ্ভব, এই যে নতুন কিছু সামাজিক পরিবর্তন হোলো, এই থেকেই—কিছুতেই মন তা মানে না। আমার কবিতা কী থেকে হোলো তাহলে। একটা উৎস থেকে হয়েছে—বহুদূরের স্রোত থেকে, ইতিহাস থেকে নয়। এইজন্য কথায় কথায় আমি সেই দূরের বাণীকে প্রকাশ করেছি। এই কবির এই কবিত্ব—এইখানেই তার মূল কথা। কোনো ইতিহাস তাকে বানায়নি—সকল ইতিহাসের মূলে সেই সৃষ্টিকর্তা বসে আছেন। কবি একলা, তাই হওয়া উচিত। একেবারে অন্তরীক্ষে,

> বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
> তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥

সেইজন্যই লোকে বুঝতে না পারে যদি—কী করব। যে একলা মানুষ একলার কথা বলে—তা পাঁচজন যদি না মানে তবে উপায় কী। কোনো এক সময়ে প্রবেশ করে গোপন কক্ষে মানুষের মন। একথা অনুভব করো না যে তোমরা অন্য জাতের লোক? যেখানে এ সমস্ত কল্পনার খেলনা, রচনাগুলো তৈরি হয়ে উঠেছে, কী দৃষ্টি থেকে, মনের কোন্ বেদনা থেকে—বুঝতে পারবে না।

৭ই জুলাই, ১৯৪১.

মূলকথা হচ্ছে যে, সাহিত্য সাময়িক হোতে পারে না। এখন কথা উঠেছে যে, কোনো একটা ইতিহাস থেকে সাহিত্য এসেছে। তা হোতে পারে না : সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা একেলা—সে ভিতর থেকে প্রকাশ করে। এ বিশেষভাবে বলেছিলুম—তা শোনবার যোগ্য। আমি যে ভোরবেলায় উঠে তাড়াতাড়ি সূর্যোদয় দেখবার জন্য বাইরে যেতুম সেই শীতের দিনেতে—সে এই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নয়। সে ভোর রাত্তিরে ছুটেছে, নারকেল গাছে রোদ্দুর ঝিলমিল করছে—তা দেখতে। একদিনও আমি বঞ্চিত হতুম না দেখতে। এটা তো কোনো ইতিহাসে ছিল না। এই মনোবৃত্তিটা যে-কবির সে একেলা।

একদিন দেখলুম ধোপার গাধাকে লেহন করছে গাভী মাতৃস্নেহে। এত আনন্দ হোলো—বলতে পারিনে। কোনো ছেলে আমার বয়সীর তা হোত না। এ তো সাময়িক নয়—আপনার ভিতর থেকে এ এসেছে। এর থেকে কবিতার অঙ্কুর বেরিয়েছে, ফলিত হয়েছে। তখন নানা রকমের ঘোরতর ব্যাপার চলেছে—মিউটিনীর পর সামাজিক পরিবর্তনের মুখে। এগুলোর একটি বিশেষত্ব আছে। ছেলেবেলা থেকে আমি একরকম করে ভেবে-ছিলুম—দেখেছিলুম। তাদের দেখি বিচিত্রভাবে। সেই-খানে রবীন্দ্রনাথ একলা তার আসন নিয়েছিলেন; জগৎ সংসারকে তার নিজের মনোবৃত্তি নিয়ে দেখেছিলেন। তখন

ইতিহাস কী বলেছিল। সৃষ্টিকর্তা একেলা—সে চারিদিকের ঘটনা দ্বারা আবৃত। তারই মন নিয়ে সে ভেবেছে, বের করেছে এক-একটা রূপ।

সন্ধে

পড়ে আছি, পড়ে আছি, পড়ে আছি। তারা আসে, দেখে—চলে যায়।

৮ই জুলাই, ১৯৪১

এ ভালো লাগে কি লাগে না আমি বলতে পারিনে। আমার কাব্য কিংবা গল্প—এ আমি জানি। কিন্তু আমার ছবি—ভালো কি মন্দ বুঝতে পারিনে। সেইজন্যে আমি কিছু বলতে পারিনে। আমি বুঝতে পারিনে কোন্‌খানে আমার গুণপনা—তাই এতে আমার কিছু বলবার নেই।

৯ই জুলাই, ১৯৪১

কাল রাত্তিরের ইতিহাস—একসময়ে ঘুম ভাঙল—বললে সাড়ে নয়টা। আমি আরো ভেবেছি রাত পুইয়ে গেল।

... ...

গায়ের তাপ ও নাড়ী যতই বাড়ুক কমুক, আমরা যারা তাঁর সেবা করতুম আমাদের জানা ছিল যে তাঁকে কত কমিয়ে বাড়িয়ে বলতে হবে। তাই মাঝে মাঝে এই নিয়ে কিছু বলেন, হয়তো বা বোঝেন সবই এঁরা ওঁকে অন্যরকম বলছি কিন্তু বাইরে তা দেখাতেন না।

কবিরাজ কী বলছে জানো। নাড়ীটা বেশ ভদ্র রকম চলছে। তোমরা বলবে কেবল চুরাশি-ছিয়াশি।

তারপর মজা করেই গল্পচ্ছলে গেয়ে উঠলেন :

কাটো হে কাটো হে এ মায়া বন্ধন,
নিবারো নিবারো এ মায়া ক্রন্দন।

মায়া কাটাও যত শীঘ্র পারো, কতদিন আগে এ-কথা বলেছি—

বলে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। ঘরে দু-চার জনের আসা যাওয়া হোতে লাগল, কথাও বললেন দু-চারটা, কিন্তু ঘরের থমথমে ভাব আর কাটছে না কিছুতেই। গুরুদেব বুঝতেন সবই। তাই একথা ওকথার পর হাত নেড়ে চোখ বড়ো বড়ো করে গেয়ে উঠলেন :

কী কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানী
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি
ও সজনী—

খিলখিল করে হেসে উঠলুম—গুরুদেব বললেন :

আমার হয়েছে তাই।
কী গান বানিয়েছে সাহেব কোম্পানী
গানেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি।
আমার গানও তেমনি হয়েছে—
আচ্ছা, সত্যি কি না বল্—ও সজনী?

৯ জুলাই, ১৯৪১

চুপটি করে বসে আছেন সকালে—জানালাটির ধারে। সামনের কৃষ্ণচূড়ার একটি ডালে দু'তিন থোকা কৃষ্ণচূড়া তখনো সবুজ গাছটিকে শোভামণ্ডিত করে রেখেছে। গুরুদেব চশমা বদলিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বললেন :

সৃষ্টিকর্তা আমার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছেন। এত করে, এতকাল ধ'রে, এত সেবা আমি দিয়েছি, তার-

পরে আমাকে এমনি করে পঙ্গু করলেন। অকৃতজ্ঞ বিধাতা! না, অকৃতজ্ঞই বা বলি কী করে। দিয়েছিলেন তো আমাকে সব, ঢেলেই দিয়েছিলেন; কোনোদিক থেকে কোনো কৃপণতা করেননি এতটুকু। আজও যদি সবই থাকবে আমার তবে বয়স হবার তো মানে থাকে না কিছু।

... .

জীবন আমার সঙ্গে কী খেলাই খেলছে দেখ্ না। রাখবে কি কিছু। না, আমার সঙ্গেই সব শেষ হবে।

... ...

একটু শান্তি দাও, একটু সান্ত্বনা দাও। দিন চলে যাচ্ছে, আর তো বেশি দিন নেই।

... ...

সত্যিই আর দিন বেশি ছিল না। ধীরে ধীরে সেই চিরশান্তির দেশে তিনি চলে গেলেন।